ফিলাডেলফিয়া

সা হি ত্য প ত্রি কা

১

মে ২০২৫

Philadelphia
a magazine of Bangla arts & culture
edited by Ahmed Sayem
volume 01 published on May 2025

ফিলাডেলফিয়া

Philadelphia

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মে ২০২৫

সম্পাদক

আহ্মদ সায়েম

প্রচ্ছদ ও নামলিপি

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

মুদ্রণপূর্ব প্রুফশোধন ও মুদ্রণপরিবীক্ষণ

ড্রাফট অ্যান্ড ক্রাফট স্বর্ণশিখা ২৮ কদমতলি ৩১১১ সিলেট +৮৮০ ১৭১৬৮৩৩১১৭

মুদ্রণখানা

মিম প্রিন্টার্স লালবাজার রোড বারুতখানা সিলেট ৩১০০

সম্পাদকীয় সংযোগ

7820 Summerdale AVE Philadelphia PA 19111

ahmedsayem@gmail.com +1 (929) 732-5421

মূল্য

১৫০ টাকা   20 USD

সম্পাদকীয়

মেলা ও মুখপত্র ০৫

কবিতা

আলী সিদ্দিকী ০৭ এইচ বি রিতা ০৮ কাউসারী রোজী ১০
মাধব দীপ ১২ রওশন হাসান ১৪

গদ্য

ফিলাডেলফিয়া নিয়ে কিছু কথা
জিয়াউদ্দীন আহমেদ ১৬

ভাষা, মাতৃভাষা
ফজলুররহমান বাবুল ১৯

সাক্ষাৎকার

লেখা একটা আসমানি ওহি
বদরুজ্জামান আলমগীর ২৪

গদ্য

প্রসঙ্গ ফিলাডেলফিয়া বইমেলা
আশরাফুল আরিফ ৩০

মালজোড়া গানের সনতারা বেগম
সরোজ মোস্তফা ৩২

অনুবাদ কবিতা

লুইস গ্লুকের একগুচ্ছ কবিতা
আল ইমরান সিদ্দিকী ৩৭

মায়া সারিশবিলির কবিতা
মঈনুস সুলতান ৪১

গদ্য

আবেদা খানম বালিকা বিদ্যালয়
পাপড়ি রহমান ৪৮

গান নিয়ে
বিজয় আহমেদ ৫১

অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা
রাজিয়া নাজমী ৫৩

গল্প
আহমদ মিনহাজ ৫৯
কুলদা রায় ৬৭
পলি শাহীনা ৭০
বদরুন নাহার ৭৪
নাহিদা আশরাফী ৮০

কবিতা
মাসুম আহমদ ৮৬ রাহাদ আবির ৮৯ লায়লা ফারজানা ৯২
সন্তর্পণ ভৌমিক ৯৬ হাসান রনি ৯৯

অনুবাদ গদ্য
মাহমুদ দারবিশের বক্তৃতা
এমদাদ রহমান ১০২

গদ্য
সৈয়দ গুলাম মহিউদ্দিন আহমেদ বিন খইরুদ্দিন আল হুসেইনির দূরদর্শিতার অভাব
অতীশ চক্রবর্তী ১০৬

বিরুদ্ধ আলাপ বা সময়ের দাগ
অভীক সোবহান ১১১

রোডসাইড টিস্টলের আড্ডাটা আজ আর নাই
জাহেদ আহমদ ১১৮

কবিতা
আলফ্রেড আমিন ১২২ নির্ঝর নৈঃশব্দ্য ১২৭ বদরুজ্জামান আলমগীর ১৩০
হাসান শাহরিয়ার ১৩৪ জয়দেব কর ১৩৭

অন্যগল্প
আহমদ সায়েম ১৩৯

মেলা ও মুখপত্র

ফিলাডেলফিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম জনবহুল শহর, শুধু এখনকারই নয় বরং এক সমৃদ্ধ অতীতেরও ধারক। এই শহর, যার প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম আমেরিকান রাজধানীর মর্যাদা নিহিত, বহু ভাষাভাষী ও বহু সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মিলনস্থল। ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষার পাশাপাশি এখানে চায়নিজ, ভিয়েতনামি, ফরাশি, আফ্রিকান, কেরেলা, আরবি, ইন্ডিয়ান ও বাংলাদেশি ভাষাভাষীরাও বাস করে। তবে এই সংখ্যার হিসাব এখানকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সীমানা চিহ্নিত করতে যথেষ্ট নয়; শতাধিক ভাষার মানুষের সমাবেশে এই নগরী এক অপরূপ সংগঠিত সমাজের ছবি তুলে ধরে। শহরের প্রতিটি কোণে ইতিহাসের ছোঁয়া আর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, পোশাক, খাবার, শিল্পকলা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি মিলেমিশে এক বর্ণিল এবং আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই বৈচিত্র্যের মেলবন্ধনে কালে-কালান্তরে ফিলাডেলফিয়া একটি উদার, জীবনমুখী ও সৃজনশীল জনপদে পরিণত হয়েছে।

এই শহরে আনন্দ ও সৌন্দর্যের অভাব কখনোই ছিল না, ছিল বাংলা ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীর একটি বইমেলা এবং শুধুমাত্র সাহিত্য ও শিল্পকলাকেন্দ্রী বিচিত্রা আর্টপত্রিকার অভাব। সুখবর হচ্ছে, এই দুটো অভাবের উৎসাদন হতে চলেছে এবার। দু-দুটো উৎসবমুখর উদ্যোগ অবশেষে একসাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে, এক বইমেলা ও দুই বাংলা ভাষাভাষীদের মুখপত্র। 'সবরকম বই পড়ি / মনকে মনন করি' শীর্ষক সোচ্চার প্রতীতি প্রকাশের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো 'ফিলাডেলফিয়া বইমেলা ২০২৫' আয়োজিত হচ্ছে পেন্টেকোস্টাল চার্চ ভেন্যুতে ৩১ মে, যে-মেলা এই জনপদের সকলের সহযোগে একটি নিত্যবার্ষিক সম্মিলনের রূপ পরিগ্রহ করতে চায়; যেখানে, বলা বাহুল্য, বিনিময় হবে বাংলার সঙ্গে বিশ্বের, যোগ হবে সহিষ্ণু পরমতের। একই সময়ে একটি মুখপত্র প্রকাশ মেলা ও মিলনোৎসব অধিক আনন্দ ও মঙ্গলময় হবার ইঙ্গিতবাহী। 'ফিলাডেলফিয়া' নামে এই মুখপত্র বঙ্গীয় মনন ও সৃজনের শুধু শোকেইস নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে লালনক্ষেত্র হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে অভিষেকেই।

মিথস্ক্রিয়ার পরিসর তৈরি না করে একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের বিকাশ বজায় রাখতে পারে না। কাজেই, ফিলাডেলফিয়া বইমেলা ও সমনামী সাহিত্যপত্রিকার প্রয়াসের ভিতর দিয়ে একটি বিনিময়মুখর মননমুখী, সৃজনশীল ও সজ্জন জনপরিমণ্ডল উন্নয়নের দিকে আগুয়ান থাকবে সবসময়। কাজটি রাতারাতি হবার নয়, স্বীকার করব নিশ্চয়। এর সঙ্গে জড়িত অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে যে-আবহমান, দরকার তার নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা। আমাদের উজ্জ্বল আবহমানের আলোকবর্তিকা আমরা হ্যান্ডোভার করতে চাই নিজেদের উত্তরপ্রজন্মের কাছে। মেলায় সক্রিয় ও সপ্রেম যুক্ত হব সবাই, লিখব মুখপত্রে এবং পড়ব অস্তিত্ব উদযাপনের প্রতিবেদন।

অভিষেক সংখ্যায় যারা লিখলেন, ফিলাডেলফিয়া ছাড়াও দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী কবি ও সাহিত্যিক, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত ধন্যবাদ রইল। সহযোগ দিলেন আরও যারা, মেলা ও মুখপত্র সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, তাদের সকলের লিপ্ততা আগামীতেও বজায় থাকবে এমনটা আশা রাখা আদৌ অতিশয় নয়। আর, আগামী দিনগুলোয়, 'ফিলাডেলফিয়া' কাগজের আবর্তিত পত্রালিকায়, বাংলার মাননিক ঐশ্বর্যের অব্যাহত উৎসার ও উদ্ভাস যেন গোচরীভূত হয়।

উৎসবমুখর এমন একটা আয়োজন ব্যবস্থাপনায় থাকে বহু মানুষের সমর্থন, সহযোগ, উদ্যম ও উদ্দীপনা। আর বিশেষভাবে উল্লেখ কর্তব্য যে এই ধরনের বড় আয়োজন প্রথমবারের মতো করার ফলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের সম্মিলনে এমন অনেক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে যা ভবিষ্যতের জন্য গল্প হয়ে রইল। সকলের অবদান ও অংশগ্রহণ আমরা সকৃতজ্ঞ স্মরণ করি। বিশেষ কারো নাম উল্লেখ করা থেকে এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিরত রইছি। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেই নয়, যারা এই সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে আদ্যোপান্ত সশ্রম মেধা ও সময় বিনিয়োগ করেছেন, তারা হলেন সর্বজনাব আলী সিদ্দিকী, রাজিয়া নাজমী, আশরাফুল আরিফ, কামরুল হাসান, আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, জোহরা খাতুন কলি ও বদরুজ্জামান আলমগীর প্রমুখ। শুধু এই কয়জন মাত্র নয়, তারা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্য সকলেই বিশেষ তারিফ পাবার হকদার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়তো নয়, কিন্তু অবহিত করে রাখি যে 'ফিলাডেলফিয়া' কাগুজে মাধ্যম ছাড়াও অনলাইন সমাজমাধ্যমে অ্যাভেইল্যাবল থাকবে বছরভর। বছরের নির্দিষ্ট ক্ষণে পত্রিকা ছাপা হবে, ফেইসবুকে এক্সে ইন্সটায় পাঠকসংলগ্ন থাকবে সে সর্বপ্রহর। যুক্ত হই, মুক্ত করি, নির্বিশেষ বাহির ও অন্তর।

আলী সিদ্দিকী

পরাজয়

ক্যানভাসের উল্টো পিঠে আঁকা হয়ে গেছে
আমার পরাজয়
তোমার অমোচনীয় নাম
ভুলতে গিয়ে তোমাকে এই ছোট্ট জীবনে
মনের অজান্তে নিজেকেই হারালাম।

তোমাকে হয়নি দেয়া আমার মুক্ত আকাশ
হয়নি দেয়া বেদনার রঙে রঙিন
একটি অবুঝ মন
দিয়েছি শুধু দুঃখ এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া
ভোলার জন্য আমরা কখনো করিনি পণ।

সে-ই অন্ধকার

বর্ণচোরা প্রেমিকরা যখন পরকীয়ায় মাতে
বানোয়াট অজুহাতে বন্ধু হয়ে যায় শত্রুর
যতোই ভালো সাজুক তারা ছলাকলা করে
জেনে নিও অসৎ সে ভীষণ রকম ধুরন্ধর।

দিয়েছো যার হাতে প্রেমের মহামূল্য পতাকা
চেয়েছো সুরক্ষা তুমি শস্য আর মৃত্তিকার
একটি নির্মেদ মানচিত্রে এঁকে নেবে পটচিত্র
প্রতিদানে পেলে চিরকেলে সে-ই অন্ধকার।

এইচ বি রিতা

অনুস্মারক

দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছি বিভক্ত ছিদ্র
সাথে একটি বেদনাদায়ক অনুস্মারক।

জানালার পাশে দাঁড়াতেই দেখি
মধ্যরাতের কাস্তের বাঁকা চাঁদ ইশারায় ডেকে যায়
টিপটিপ পায়ে এগিয়ে যাই দরজার কাছে
উম্মুক্ত হতে শত ভয় যার, সেই আমাকেই আঁধার
আলিঙ্গন করে অকপটে।

রাতের সাথে আঁধারের মিথস্ক্রিয়ায়—দীপ্তিময় ভোর
উদ্ভাসিত হয় নব প্রত্যয়ে
লুকোচুরি খেলায় হেরে গেলে শতেক পথিক
বিজড়িত রেখাগুলি চলার পথে মোজাইক তৈরি করে।

অথচ, আমি ভেঙে পড়লেও ভেঙে পড়ি না
কেননা, আমিই সেই বেঁচে থাকার অনুস্মারক।

স্বাগত তোমাকে

আজ না-হয় পথে হাঁটি একা—আলোহীন কালোয়
দেখে নেই মনের কৈতবের প্রকারভেদ।
যদি বলো, হিংস্র ক্ষুদ্রচেতা নারী তুমি স্খলিত হও,
তবে স্বাগত জানাব তোমার তীব্রকণ্ঠের নিনাদিত স্বর।

তুমি হয়তো জানো না,

নভস্থিত মানুষের হারাবার কিছুই বাকি থাকে না।
তুমি এ-ও জানো না,
অর্ধেক রেখে গেলে পদচিহ্ন বালুকাবেলায়;
হারানো পথে আবারও হয় নবজন্মের উৎসব।

আজ না-হয় তবে পথে হাঁটি একা—
আলুথালু আলোক-ঋণে
যদি আশ্বাসবচন দাও, তখনো স্বাগত তোমাকে।

কাউসারী রোজী

বাগাডুলী বল

আমি বাগাডুলী বলের মতো ঘুরতে ঘুরতে
বের হবার পথ খুঁজি একই চক্রে,
সব পথ যদি ভুল হয়
হাড় কাঁপানো সারাদিন শ্রমের বিনিময়ে কোথায় দাঁড়াই?

গড়পরতা সীমান্তের সীমাবদ্ধতা
সামাজিক যোগাযোগ রেললাইনের ওপর গড়িয়ে
গন্তব্য হারিয়ে একসময় নিয়তির উপর দাঁড়িয়ে যাই।

নিরবধি কালের পিঠে মাটির কলস ভেঙেচুরে
শেষাবধি হাওয়ায় উধাও
ভাংচুর বিশ্বাস
ফরিয়াদ জায়নামাজে।

অসুস্থ শক্তি

ঐ বনে পড়েছিল পাতাদের হলুদ মৃতদেহ
পাতায় আরো ছিলো পিঁপড়ার সারিবাঁধা
কোঁকড়ানো দেহ।
চমকে ওঠে পশুপ্রেমী

অনেক শোরগোল ওঠে, মিছিল কার্ফু আর
হরতাল অবরোধ আন্দোলনে
নড়েচড়ে ওঠে সরকার।

বন্ধ করো প্রকৃতি নিধন।

সভ্যসমাজ বনে পড়ে আছে
হাজার হাজার মানুষের
কোঁকড়ানো দেহ — যার অধিকাংশই নারী ও শিশু।
কোথায় তেমন বন কাঁপানো ঝড়
যাতে উড়ে যায়,
অত্যাচারী হত্যাকারী হামলাকারীদের
অসুস্থ শক্তি।

মাধব দীপ

একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা

শোনো বন্ধু—শরীরে বিষক্রিয়া নিয়েও নতুন জন্ম হয় কোনোকোনো মানুষের। বাঁশ পুড়িয়ে হয় যে বাঁশি তার বিষাদকীর্তন তো নতুন জন্মেরই সুর। দোহাই আল্লার—আমার মলিন মুখ নিয়ে তোমরা যেও না কোনো বিধাতার দরবারে। ...যদি কখনো দেখা হয় তবে শুধু বলে দিও—তারে দিবো বলে বহু আগেই সঁপে রেখেছি আমার অনাগত প্রতিটি জীবন। যে সর্বনাশী, তার কাছেই তো জীবনের সব ঋণ! সে না জানিলো, তোমরা তো জানো—আমার তাবৎ শব্দের অঞ্জলি, তার পায়েই লুটিয়ে পড়ে সব। সে লুটেরা তপস্বিনী জেনেই তো আমি হয়েছিলাম অমন গৃহত্যাগী সাধু। আর ক্ষতিই বা হবে কী—যে-চোখে তাকিয়ে নিয়েছিলাম পুনর্জন্ম, সেই চোখের আগুনেই ভস্ম হই যদি!

২

হাত ধরে যে শুনিয়ে গেল ওম-সংগীত—ট্রেনের হুইসেল বাজার পর তার পায়ের কাছে পড়ে রইলো শীতরাতের প্রার্থনা। বিদায়ী আঙুলের করুণ সংকেতে খুলে গেল একটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গোপন দরোজা। জোড়া চোখের ভিতর জাগিয়ে গেল হাজার জলজ চোখ। মোহন ছায়ার পরশ বুলিয়ে সে আসলে হয়ে গেল মায়া-হরিণ।

৩

কারেন্টজালের ব্যূহ ছিঁড়ে নদীতে লাফিয়ে পড়া মাছের যে হাসি তা তোমার হৃদয়ে রঙধনুর ঢেউ তুলে যাক। তা-হা-র দেখানো একেকটা তাচ্ছিল্য গোপনে এঁকে যাক তোমার কবিতার নাকফুল। বৃন্দাবন বানাতে গিয়ে তুমি তালেবান দেখেছো বহু। সবাইকে সাথে নিয়ে একা হয়েছো বারবার! বহুকাল বর্ষণ শেষে আজ শাদা

হতে দেখেছি তোমার কৃষ্ণ আকাশ। এবার পাখি হও তুমি। ওড়ো আর চোখে-মুখে মাখো রংধনুর রঙ। একা না থাকাটা আসলে মানুষের নিখুঁত সঙ্।

৪

যদি ছুঁইয়া যাও—তবে এই আন্ধাইর রাইত পুন্যিমার জোয়ারে ভাইসা যাইবো। জোছনা-চুয়ানো চুম্বনে খোয়াব পোয়াতি হইবো। এই খাঁখাঁ বুকের জমিন হইবো ভরা ভাদ্রের জলে টুইটুম্বুর যুবতী। এইখানে—এই পাঁজরে—আইজও যে টনটন করছে গোপন ব্যথা, তা-ও হাওয়ায় উইড়া যাইবো। আর হাসতে-হাসতে আমি দুঃসাহসী হমু, তোমার দহনকাল কাইড়া লমু। ছলাকলা দূরে থুইয়া আঙুলের তুড়িতে থামামু দারুণ পতন। এরপর পরানের গহীনে ধরমু সাধের মিলন-কীর্তন।

রওশন হাসান

সমবেত প্রার্থনা

ভাবনাগুলো আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে
দিন-রাতের ক্রমাগত আবর্তনে
আমরা কি সত্যিই নিজেকে মানুষ ভাবি?
পরন্তু আমরা শুধুমাত্র মানুষের আদল নিয়ে চলি।

আমরা দেশ, অঞ্চল, যুদ্ধ সৃষ্টি করেছি
আমাদের অস্তিত্ব, জাতীয়তা, পরিচয়, নিয়ম, ব্যবস্থা
জয়-পরাজয় গঠন করেছি
আমরা সম্প্রদায়, ধর্ম, সংস্কৃতি, বর্ণবাদ, শ্রেণী, ঘৃণা নির্মাণ করেছি
আমরা কি বুঝতে পারি না যে আমরা মানবিকতা ভুলে বিভেদ তৈরি করেছি?
মহাদেশ, ধনী, দরিদ্র, সভ্যতা, ক্ষমতা, অবস্থান
এইসব অসমতা উদযাপন করে চলেছি?
আমরা কি চিরতরে অনৈক্য নির্মূল করতে পারি না?
বদলে শান্তি, সান্ত্বনা এবং ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করতে কি পারি?

আমরা বিভক্তির গণ্ডিতে বসবাস করছি
সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ
আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ
জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ
মানবিক ও অতিমানবিক হতে অব্যক্ত প্রার্থনা আমার
ওহ সৃষ্টিকর্তা! মানবতার বিজয় রক্ষা করুন।

স্পন্দন

আকাশের আছে প্রেম, প্রিয়তম মেঘ
পালকে পালকে রোদের অভিষেক
ফুলের আছে রূপ, গ্রীবা জড়ানো পাতাদের সংলাপে
অব্যক্ত কথারা জমে থাকে, আমার চোখে যেমন তোমার শব্দেরা কাঁপে।

বৃক্ষের আছে ছায়া, সংগোপন মায়ার সংশ্লেষ
বিকেল নামায় সন্ধ্যা, রেখে যায় দিনের রেশ
এমন বর্ণিল দিনে ঘাসের পল্লবে অনুরাগ বিছিয়ে দাও
জলের দর্পণে নীল ভেসে চলে, মুগ্ধপ্রবণ আমাকে অমর করে দাও।

ফিলাডেলফিয়া নিয়ে কিছু কথা

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

ফিলাডেলফিয়া আমেরিকার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শহর। এটি পেনসিলভানিয়া রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর। **১৬৮২** সালে, আমেরিকার স্বাধীনতার আগেই, ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম পেন এই পেনসিলভানিয়া (বাংলায় 'পেনের জঙ্গল') রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে ফিলাডেলফিয়াতেই এসে নামেন।

উইলিয়াম পেন একজন কোয়েকার ছিলেন। কোয়েকাররা খ্রিস্টানদের একটি গোষ্ঠী, যারা মানবতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করতে চায়। তাদের উপাসনালয়কে "ফ্রেন্ডস মিটিং হাউস" বলা হয়, যেখানে তারা নীরবে প্রার্থনা করে। তারা বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক মানুষের আত্মার আলোই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এজন্য তাদের উপাসনালয়ে কোনো ছবি বা মূর্তি থাকে না। ইংল্যান্ডে ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়ে কোয়েকারদের অনেকে নতুন দেশে এসে বসতি গড়েন।

ফিলাডেলফিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠানের পেছনে কোয়েকারদের অবদান রয়েছে, যেমন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া ও সোয়ার্থমোর কলেজ। তারা দাসপ্রথা বিলুপ্তির জন্য প্রথম শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করেন। যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্যও তারা সবসময় সক্রিয় ছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ফিলাডেলফিয়ার ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, কোয়েকার ও আফ্রিকান-আমেরিকান সমাজ ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর বন্দরে ঐতিহাসিক "ব্লকেড" গড়ে তুলেছিল। আমেরিকা যখন পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র সরবরাহ করছিল, তখন কোয়েকারদের তরুণ-তরুণীরা ছোট নৌকা নিয়ে বিশাল পাকিস্তানি জাহাজের

সামনে প্রতিবাদে দাঁড়ায়, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে জাহাজ আটকানোর চেষ্টা করে।

পরে তারা মায়ামিতে খালাসিদের সম্মেলনে গিয়ে পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার বিষয়ে জনমত গঠন করে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ড. মনয়াম চৌধুরী (একজন পিএইচডি ছাত্র) এবং সুলতানা আলম ক্রিপিনডর্ফ। সুলতানা আলম শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধে, চোখে জল নিয়ে বলেছিলেন—

> "তোমরা কেন আমাদের পরিবারকে হত্যার জন্য নিজ হাতে জাহাজে অস্ত্র তুলে দিচ্ছ? আমরা নির্বাচনে জয়ী হয়েও পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যার শিকার হচ্ছি!"

তাঁর মাত্র তিন মিনিটের বক্তৃতায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর, আমেরিকার কোনো বন্দরে আর পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র ওঠানো হয়নি। ফিলাডেলফিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা রিচার্ড এসকিউ ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমরা তাদের জাহাজে শুধু সামরিক অস্ত্র নয়, আমরা কিছুই তুলবো না!"

এই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অনেকেই সহায়তা করেছেন, তবে কোয়েকার ও কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অবদান আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত।

ফিলাডেলফিয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আমেরিকার ইতিহাসে ফিলাডেলফিয়ার অবদান অপরিসীম। এখানেই ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৭৮৭ সালে, ফিলাডেলফিয়াতে আয়োজিত কনভেনশনে আমেরিকার সংবিধান রচিত হয়, যা বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফিলাডেলফিয়ার অদূরে ভ্যালি ফোর্জ পাহাড়ে আমেরিকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির ছিল, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আজও ফিলাডেলফিয়ার ডাউনটাউনে অসংখ্য ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে, যেখানে পর্যটকরা প্রতিনিয়ত ভিড় করেন। লিবার্টি বেল ও কনস্টিটিউশন হল্ দর্শনার্থীদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ।

ফিলাডেলফিয়া গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ "ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসার শহর"। ২০১৪ সাল থেকে শহরটিকে Sanctuary city বা অভয়ারণ্য শহর ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্থানীয় পুলিশ অভিবাসীদের তথ্য

ফেডারেল সরকারের কাছে হস্তান্তর করে না এবং অভিবাসীদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ফিলাডেলফিয়া : শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ফিলাডেলফিয়া শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধ। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দেয়ালচিত্র (মুরাল) সংরক্ষণকারী শহরগুলোর মধ্যে একটি।

এই শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা প্রতিটি অভিবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। আমাদের উচিত নিজেদের ছোটখাটো বিভেদ ভুলে গিয়ে শহরের মর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা। বর্তমান সময়ে অভিবাসীদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতির জন্য ভালো মানুষ ও সুনাগরিক হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

ভাষা, মাতৃভাষা

ফজলুররহমান বাবুল

মানুষের যৌথ জীবনযাত্রায় ভাষার তাৎপর্য অনেক। কোনও বাক্‌শক্তিহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন স্থবির, কঠিন। ভাষা কী, এমন প্রশ্নও ভাষা ছাড়া হয় না। কোনও বিষয়ের সংজ্ঞা দিতে ভাষার প্রয়োজন হয়। ভাষার সংজ্ঞাটিও ভাষা ছাড়া দেওয়া যায় না। ভাষা ছাড়া একজন আরেকজনকে (কোনও-একটি রীতির ভিতরে) জানাতে পারেন না। যে-অর্থবহ ধ্বনির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তা-ই ভাষা। ভাষার সাহায্যে একজন আরেকজনের কাছে ভালোবাসার কথা জানাতে পারে, বিরক্তি কিংবা ঘৃণার বিষয়ে জানাতে পারে। ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশের এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে এক আলাদা বৈশিষ্ট্যেও উন্নীত। পৃথিবীতে আলাদা আলাদা সমাজ বা গোষ্ঠীভিত্তিক ভাষা/উপভাষা বিদ্যমান। নানান জাতির নানান ভাষা।

মানুষের চিন্তার প্রকাশ হয় যে-ভাষার আবরণে সেই ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। মানুষ জীবনে কতরকম ধ্বনি কতভাবেই ব্যবহার করছে! এই বিষয়ে আমরা সচরাচর ভাবিও না। ধ্বনিবদ্ধ ভাষা ছাড়াও মানবসমাজে আরও এক ধরনের ভাষার প্রচলন আছে, তা হল ভঙ্গিভাষা। আধুনিক মানুষের ধারণা, ভঙ্গিভাষা মানবসমাজের আদিভাষা। আদিম মানুষ ভঙ্গিভাষা ব্যবহারে অনেক দক্ষ ছিল। হাল আমলে মানবসমাজে ভঙ্গিভাষার ব্যবহার অতি সীমিত। অর্থবহ ধ্বনি উচ্চারণের জন্য মানুষ বাগ্যন্ত্রকে ব্যবহার করতে শুরু করার পর থেকে ভঙ্গিভাষার ব্যবহার কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। মানুষ ব্যতীত অন্যবিধ প্রাণী (অর্থবহ) ধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়; সক্ষম হলেও সেটা মানবসমাজে আজ অবধি অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীতে অর্থবহ ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বটা এযাবৎ মানুষেরই দখলে।

ভাষা মানুষের স্বোপার্জিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। মানুষ কর্তৃক ভাষা অর্জনের ক্রমধারাটিকে চিহ্নিত করা হয় যে-রকম : অঙ্গভঙ্গি/ইশারা-ইঙ্গিত > অর্থহীন ধ্বনি > অর্থযুক্ত ধ্বনি > ধ্বনিগুচ্ছ বা শৃঙ্খলাহীন বাক্য > শৃঙ্খলিত শব্দসমষ্টি বা যথার্থ বাক্য।

মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ভাষা আয়ত্ত করে। অর্থবহ ভাষার ক্ষেত্রে মানুষের রয়েছে নিরন্তর অনুসৃতি ও অধ্যবসায়। অনুসৃতি ও অধ্যবসায়ের ভিতরে মানবজাতির ভাষা বিকশিত ও উন্নত হয়েছে। মানবভাষার বিকাশ ও উন্নতির পিছনে নিরন্তর ভূমিকা রেখেছে মানুষেরই প্রয়োজন।

পরিস্থিতি অনুসারে (সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে) মানুষের অন্তরিন্দ্রিয়ে যুক্তির ও বুদ্ধির আলোকে ভাষার উদ্বোধন হয়। মানুষ তার জীবনযাপনের নানান ক্ষেত্রে নানান প্রয়োজনেই ভাষা চালু করেছে। আজ অবধি মানবভাষার উদ্ভবসংক্রান্ত সকল রহস্যের সুরাহাও করা যায়নি; যেহেতু মানুষের আদিম অবস্থায় জীবনযাপন, পরিবার, সমাজ, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়েই আধুনিক মানুষ আজও পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়নি। নানান কারণে ভাষারহস্যের অনেক-কিছু আজও অনুমাননির্ভর। ভাষার উদ্ভবসংক্রান্ত রহস্যটি বিজ্ঞানের দরবারে আজও অমীমাংসিত।

ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভে গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের সামনে নানান সীমাবদ্ধতা বা ধোঁয়াশা আছে; আছে নানান মত বা মতবাদ। ভৌগোলিক অবস্থান, জাতি, ধর্মভেদে ভাষাসংক্রান্ত সংস্কারও কম নয়। জৈন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মানুষসহ সকল জীবজন্তুর মূল ভাষা অর্ধমাগধী। সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা, এমন বিশ্বাস হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে; তেমনই মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস আরবি আল্লাহর ভাষা এবং বেহেশতে সকলের ভাষাও হবে আরবি-যেহেতু কোরআনের ভাষা আরবি। বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস মূল ভাষা হল পালি; অনেক ইহুদি এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টানের মতে বাইলের ওল্ড টেস্টামেন্টের হিব্রু ভাষাই মানবসমাজে প্রথম ভাষা। তবে আমরা জানি, কোনও ভাষাই নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের ভাষা নয়। ভাষার উদ্ভব বিষয়ে নানান সময়ে নানান ধারণাকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে, নানান রহস্যের স্পষ্ট সুরাহা আজও হয়নি।

অজানা অতীত থেকে যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে ভাষার চাকা অজস্র পরিবর্তনের/রূপান্তরের ধারায় পথ চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। পৃথিবীতে ভাষার আঁকাবাঁকা চলার পথে আছে বিস্তর ভাঙাগড়া; বহু রঙে ভাঙাগড়ার বিস্তার বহুদিকে।

মহাবিশ্বে বিরাজমান কোনও-কিছুই পরিবর্তনের/রূপান্তরের বাইরে নয়। কালের প্রবাহে পৃথিবীতে মানবভাষাও নানান পরিবর্তনের/রূপান্তরের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। পরিবর্তনের/রূপান্তরের মাধ্যমে নানান ভাষার উদ্ভব ও উন্নতি হয়েছে, নানান ভাষা কালের গর্ভে বিলুপ্তও হয়েছে।

জীবিত মানুষ ভাষার রূপ-রং ও পথ বদলে দেয়, কিন্তু ভাষার সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। পথ, রূপ, রং বদলালেও পৃথিবীতে কোনও-না-কোনও ভাষা ততদিনই মানবজীবনে সংযুক্ত থাকবে যতদিন মানুষ থাকবে। কোনও-না-কোনও পথে, রঙে মানুষকে কোনও-না-কোনও ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদানপ্রদান/যোগাযোগ, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণসহ বিচিত্র প্রয়োজনে ভাষার দরকার। মানবসমাজে কোনও ভাষাকে কোনও মানুষ একা একা চালু করেনি।

জীবনের নানান বাঁকে ভাষার নানান প্রকৃতি আছে, প্রতীকী গুণ আছে। সব ক্ষেত্রেই কি আমরা ভাষার সৌন্দর্য, শক্তি-সামর্থ্য কিংবা ভূমিকাটুকু উপলব্ধি করতে পারি? যে-কোনও ভাষার সৌন্দর্য, স্বাদ স্থানভেদে বা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। মানবজীবনে ভাষা সৌন্দর্যের, ভাষা চিত্রের, ভাষা চিত্রকল্পের, ভাষা আনন্দ-বেদনার, ভাষা সুস্থতা ও অসুস্থতার, ভাষা ভাবের, ভাষা জ্ঞানের, ভাষা ঐক্যের কিংবা ঐক্যহীনতার, ভাষা স্নিগ্ধ, ভাষা কর্কশ, ভাষায় লাভ, ভাষায় লোকসান!

...

আমরা যদি কল্পনা করি মানুষের কোনও ভাষা নেই, তাহলে উপলব্ধি করব আমাদের জীবনেও অনেক-কিছুর কোনও অস্তিত্ব নেই। ভাষাহীন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারলেও তার পক্ষে অনেক বিচিত্র কাজই করা সম্ভব নয়। ভাষার সাহায্যে মানুষ চিন্তা/ভাব যেভাবে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করতে পারে কিংবা কোনও তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে, সে-রকম কি আর কোনও উপায়ে সম্ভব? দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে একজন মানুষ আরও-একজন মানুষকে বাহ্যিকভাবেই দেখে; দেখে চোখের সামনে একজন মানুষ এবং ওই মানুষটির আকৃতি-অঙ্গভঙ্গি কিংবা চলাফেরা, কিন্তু ওই দেখার, যোগাযোগের বা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে অনেক অসম্পূর্ণতাকে দূর করতে পারে ভাষা-তা হোক না মৌখিক বা লিখিত ভাষা। ভাষাহীন মানুষ এত সহজে বোঝাতে পারে না, 'সবার উপরে মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' নামের বইয়ে লিখেছেন, 'মানুষ যেমন জানাবার জিনিস

ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখ-দুঃখ, ভালো কিংবা মন্দ লাগা, নিন্দা কিংবা প্রশংসার সংবাদ। ভাবে ভঙ্গিতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে, হাসিতে, চোখের জলে এই-সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। এইগুলি হল মানুষের প্রকৃতিদত্ত বোবার ভাষা, এ ভাষায় মানুষের ভাবপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুখ-দুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়, ঊর্ধ্বে যায়; তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যত দূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়াবেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে।'

আমরা আজও নিশ্চিত জানি না, ঠিক কোন সময় থেকে আদিম মানুষ চিন্তা/ভাব প্রকাশের জন্য, একটা-কিছু বোঝা কিংবা বোঝানোর জন্য অঙ্গভঙ্গি/সংকেত কিংবা যৌক্তিক ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। জানি না—আদিম মানুষ নানান সুরে আওয়াজ করতে করতে কিংবা আবেগ প্রকাশ করতে করতে ভাষার ব্যবহার শিখেছিল কি না। আমরা নিশ্চিত জানি না, পশু-শিকারের জন্য পাথরের তৈরি অস্ত্র ব্যবহারের পাশে প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার শিখে গিয়েছিল কি না।

বোধ করি, অজানা অতীতে ভাব/চিন্তা প্রকাশের জন্য সার্বজনিক কোনও ভাষা না-থাকায় (এবং আরও অনেক কারণেই) আদিম মানুষের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, উদ্ভাবনী-ক্ষমতা, নান্দনিকতা কিংবা মননশীলতা প্রসারিত হওয়ার পথটি অনেক কঠিন ছিল। অনেক ইঙ্গিতের সঙ্গে নিশ্চয়ই তারা ভাষাহীন আওয়াজে, দৃষ্টি বিনিময়ে, হাসি কিংবা চোখের জলে একে-অন্যের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করত।

মানুষ কর্তৃক ভাষা চালু বা ব্যবহারের আদি প্রক্রিয়া যেমনই হোক না কেন, ভাষা কালে কালে মানুষের জীবনে অনেক-কিছুর সঙ্গে বিবিধ সুরকে ছন্দকে কিংবা বন্ধনকে প্রসারিত করেছে। যে-সময় থেকে মানুষ তার ভাবের আদানপ্রদানে, যোগাযোগে ভাষাকে রীতি বা যৌক্তিকতার ভিতরে সত্যি সত্যি কাজে লাগাতে পারল সেই সময় থেকে মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের গতিটাও বেড়ে গিয়েছিল, তা আমরা ভাবতেই পারি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানান পরিবর্তনের ভিতরেই ভাষাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জীবনযাপনকে অনেক সহজ এবং উন্নত করেছে। ভাষা মানুষকে কত অচেনা ছোটোবড়ো পথ চিনে নিতে সহায়ক হয়েছে, কত পথ-চলাকে করেছে সহজ।

ভাষার সাহায্যে মানুষ কোনও-একটি ছবি আঁকতে পারে কিংবা গাইতে পারে গান। মানুষ যেভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও কোনও সম্পত্তি লাভ করে—সেভাবে মাতৃভাষা কিংবা অন্য-কোনও ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অর্জন করে না। জন্মের পর (শিশুকালে) মা-বাবা এবং পরিবারের অন্য লোকজনের কাছ থেকেই মানুষ ভাষা আয়ত্তের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে, নিজ পরিবারের এবং অঞ্চলের ভাষাগত প্রতিবেশে বেড়ে উঠতে উঠতে ক্রমশ আয়ত্ত করে ভাষা, আঞ্চলিক স্বরভঙ্গি এবং শব্দাবলি।

পৃথিবীতে নানান ভাষার ভিড়ে প্রত্যেক মানুষেরই একটি মাতৃভাষা থাকে। মাতৃভাষায় যে-কোনও মানুষের আপন সত্তা প্রতিনিয়ত স্বপ্নের ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা গান গায়। মানুষের হৃদয়ে সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি ফোটে মাতৃভাষায়। একজন কবি মাতৃভাষা ছাড়া তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাটি লিখতে পারেন না। মাতৃভাষার মতো অন্য-কোনও ভাষা মানুষের হৃৎপিণ্ডে বা শিরায় কম্পন তৈরি করতে পারে না। মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের হৃদয় বাঁধা থাকে এক অদৃশ্য মায়াময় সুতায়। মাতৃভাষার সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করা খুব সহজ নয়। যে-মানুষ খুব সহজে হৃদয় থেকে মাতৃভাষার মমতাকে অপসারণ করতে পারে সে নিশ্চয় কোনও জাদুকর। মানুষের জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক গভীর, নিরন্তর। মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো মাতৃভাষার সরোবরেই প্রতিনিয়ত সাঁতার কাটে। মাতৃভাষা মানুষের চিন্তার ভাষা, স্বপ্নের ভাষা।

লেখা একটা আসমানি ওহি

বদরুজ্জামান আলমগীর

একজন লেখকের লেখাই সাক্ষাৎকার। তাকে দেখতে বা ধরতে হলে তার লেখার বিকল্প কিছু দেখি না। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে দেখার ইচ্ছে জাগে, সেই আগ্রহ থেকে তাকে প্রশ্নগুলো করা। অনেকগুলো প্রশ্ন করলেও এখানে তিনটির বেশি দেইনি পৃষ্ঠা সংকুলানের জন্য। অন্য কোথাও বড় করা যাবে এই লেখা। যার সাক্ষাৎকার নিচ্ছি তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক এবং দেশ ও দেশের বাইরে যে-পরিচয়ে উনার বেশি পরিচিতি, তা হচ্ছে তিনি শক্তিশালী নাট্যকার, নাট্য-ব্যক্তিত্ব বদরুজ্জামান আলমগীর। আমরা তার কথাগুলো পড়ার চেষ্টা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আহমদ সায়েম

আহমদ সায়েম : আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অবস্থা এবং এখানকার, মানে আমেরিকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুই দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মাথায় নিয়ে বা এই পরিপ্রেক্ষিতটা আপনার লেখায় কীভাবে প্রভাব ফেলে, কীভাবে তা ব্যবহার করেন লিখতে বসে?

বদরুজ্জামান আলমগীর : প্রশ্নটার ভিতরে একটা সেয়ানা ভাব আছে। মনে হচ্ছে, লেখক বুঝি খুব ক্ষমতাধর এক আদমি। লেখক তার পরিবেশটাকে নিজের মতলব, দুরভিসন্ধি বা প্রকল্পমাফিক ওঠবস করাতে পারেন। তা কিন্তু একজন লেখক পারেন না। লেখকই বরং পরিপ্রেক্ষিতের চোখরাঙানিতে নাকাল হন, নাকানিচোবানি খান। যা-ই হোক, আপনার প্রশ্নের এনকোয়ারিটা বোধকরি আমি ধরতে পেরেছি। দেখুন, এখন আমার অবিন্যস্ত, বিস্রস্ত, ফাটাফাটা আর অনির্দিষ্ট জীবনটা দুইভাগে ভাগ হয়ে গ্যাছে—ভাগ প্রায় সমান সমান; জয় আবাহনী জয় মোহামেডান—কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান, এইরকম আর কী! ২৭ বছর ধরে আমি আমেরিকায় আছি— ভাবলে মনে হয়—ছেলে তুমি কবে জন্মালে, এত বড় হলে তুমি কার ভরসায়? প্রথমেই এই কথাটি কবুল করে নিই—নিজের জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হবার থেকে বড় আর কোনো বেদনা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। আবার এ-কথাটিও বলবো—যে-কোনো নৃশংস দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে যাওয়া একজন

লেখকের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপারও তো বটে। দুই জীবন, দুটি অভিজ্ঞতা, দুই পরিপ্রেক্ষিত মিলে এক কিঞ্চিৎকর জীবনের নিরবধি কল্লোল।

নিজের স্মৃতি হাতড়ে দেখি—ডুমরাকান্ধা বাজারের কাছে একটা জায়গায় আড়িয়ালখাঁ এবং ব্রহ্মপুত্র একমোহনায় এসে মিশেছে—দুটো স্রোতের ধারা একই গন্তব্যের দিকে যায়, কিন্তু পরিস্কারভাবে দুটি স্রোত যে আলাদা তা-ও বোঝা যায়। কোনো কোনো জিনিস মিলে, আবার কোনো কোনোটা একদম মিলে না। আন্তোনিও গ্রামশি আমার খুব পছন্দের দার্শনিক চিন্তক, জালালউদ্দিন রুমিও ভীষণ টানে আমাকে; এ হতে পারে বয়সের কায়কারবার, আবার জীবনের অভিজ্ঞানই হয়তো শিখিয়েছে আমায়—সেইন্ট পিটার্সবুর্গ, কী বাল্‌খ্‌—জীবনের তৃষ্ণার্ত মোড়ে বারামখানা হয়ে উঠতে পারে। আমার ঢাকা শহরের ডক্টর আহমদ শরীফ এখানে আমার নিজের শহর ফিলাডেলফিয়ায় এসে নোয়াম চমস্কি হয়ে ওঠেন—তেমন তফাৎ দেখি না। কিন্তু আবার যখন গোটা জিনিসটা একসাথে মিলিয়ে দেখি—বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র, একখানে দেশ আছে কিন্তু রাষ্ট্র নাই, আরেকখানে রাষ্ট্র আছে, কিন্তু দেশ নাই। দুইখানে দুরকমভাবে মন হাহাকার করে ওঠে—যার দেশ আছে কিন্তু রাষ্ট্র নাই—তার নাগরিক নাই, শুধু মানুষ আছে; কেবল পিছুটান, মায়া আর চোখের জলে ২০২৫ সনে একটি জনপদ বাস্তবি করতে পারে না; আবার যার পুরোটাই রাষ্ট্র কিন্তু কোনো দেশ নাই—তার কেবল নাগরিক আছে কিন্তু মানুষ নাই; আইনের সমতা দিয়ে আর কতদূর যাবে তারা, একে তুমি ধনবান, ফের তুমিই যে কাঙাল হয়ে রও!

আহমদ সায়েম : শত মানুষের মাঝে নিজেকে একা করতে পারেন, যা আমি দেখেছি। ওই সময়ের ভাবনা-চিন্তাকে প্রাণ দিয়ে দেন আপনার কবিতায়, কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করেন বা কবিতা কীভাবে আসে?

বদরুজ্জামান আলমগীর : ভিড়ের মাঝে, বা হট্টগোলের ভিতরে আমি লিখি, অনেকবার লিখি, লিখে ফেলতে পারি—আপনিও তা খেয়াল করেছেন দেখছি। পারি যে তার একটা কারণ বোধকরি এমন—লেখা একটা আসমানি ওহি—তা আমি কখনও মনে করি না। লেখা দিনানুদিন জীবনের লান্নত ও গৌরব। লেখকের প্রাত্যহিক অবিদ্যা, অর্গানিক বিস্ময় ও অমীমাংসাই লেখার লুম্বিনী—ওখানেই বোধিসত্ত্বের জন্ম হয়—যে গৃহহীন। ভিড়ের মধ্যে লেখায় একটা উপরি পাওনা আসে—একজন লেখকের দৃশ্যমানতার স্তর ডিঙিয়ে যে দৃশ্যান্তরে গঠিত হবার একটা চ্যালেঞ্জ থাকে—হট্টগোলের পিঠ গলিয়ে

নৈঃশব্দ্যের বৈঠকখানায় পৌঁছুতে পারলে লেখা তার প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। হা হা।

আহমদ সায়েম : আপনি তো মূলত নাটকের মানুষ, নাটক লেখার জন্য প্রস্তুতিটা কি রকম থাকে? বা গদ্য লেখার জন্য আপনি পুরোপুরি প্রস্তুত—তা কিভাবে ভাবেন?

বদরুজ্জামান আলমগীর : নাটক বা গদ্য লেখা—কবিতা বা প্যারাবলের থেকে খুবই আলাদা এক মামলা। এখানে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, নোট রাখা, শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা, ওঠানামাগুলো সন্দেহবাদীর চোখে পরখ করা, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বোধবুদ্ধির সঙ্গে দেনদরবারে বসা—এই পুরো অতৃপ্ত অসুখী জার্নির পরে একখানা প্রবন্ধ, বিশেষ করে একজন নাটক এই গরিবের ঘরে পদধূলি দেন।

আহমদ সায়েম : এই ফিলি থেকে 'ফিলাডেলফিয়া' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা আমি সম্পাদনা করতে যাচ্ছি। অনেক দিন হয় আপনি এখানে আছেন; এখানকার সাহিত্য এবং ঐতিহ্য নিয়ে আপনার কাজ সম্পর্কে শুনতে চাই।

বদরুজ্জামান আলমগীর : শুরুতেই এমন একটি নামের জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই। বলি কী—এই নামটি যখন নিয়েইছেন, টম হ্যাঙ্কস, সঙ্গে ডেঞ্জেল ওয়াশিংটনের দুর্দান্ত অভিনয় আর ফিলাডেলফিয়াকে পর্দায় দেখার জন্য ফিলাডেলফিয়া ছবিটা একবার দেখে নিয়েন। তা ঠিক, জীবনের অর্ধেক সময় আমি ফিলাডেলফিয়ায় আছি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শহর আপনাআপনি, কোনো শলাপরামর্শ ছাড়াই আমার অনেক লেখায় তার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ নিয়ে এসে হাজির হয়। নানাভাবে এর নাড়ির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গ্যাছি আমি। ভালোলাগা একটু বাচ্চাদের মতো জিনিস, তাই না? জর্জ ওয়াশিংটন ফিলাডেলফিয়ায় ছিলেন অনেকদিন—সিভিল ওয়ারের সেনাপতিত্ব করেছিলেন ফিলাডেলফিয়ার ভ্যালি ফোর্জে—এটি ভাবলে, বা বললে আমার যে ভেন্নাপাতার ছানির জীবন—তার তো কোনো রকমফের হবে না; কিন্তু তারপরও আমার এখানে কোনো বন্ধু বেড়াতে এলে তাকে নিয়ে ভ্যালি ফোর্জে জর্জ ওয়াশিংটনের ঘর দেখাতে নিয়ে যাই; ফাঁক পেলেই বলি—আমাদের কমলাপুর রেলস্টেশন যে এমন অসাধারণ স্থাপত্যে বাঁধা—তার স্থপতি লুইস কাহন আমাদের ফিলাডেলফিয়ার মানুষ; এডগার এলান পো তাঁর জীবনে সবচেয়ে ফলপ্রসূ ছিলেন ফিলাডেলফিয়ায়; বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলিন, ওয়াল্ট উইটম্যান, পার্ল এস. বাক—এরা শত নামের মধ্যে কয়েকজন মাত্র। এখানে

এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মিউজিকে ক্ল্যাসিক্যাল, আরএন্ডবি, রক, সৌল, তার সাথে আছে থিয়েটার, আছে কবিতা, আছে মুমিয়া আবু জামাল—কোনটা থুয়ে কোনটার কথা বলবো? রাজনীতির পরিসরে যেমন বাংলাদেশের মেহেরপুর মুজিবনগর, আমেরিকারও ফিলাডেলফিয়া : এর সংবিধান, স্বাধীনতার ঘোষণা, লিবার্টি বেল, প্রথম চিড়িয়াখানা, প্রথম মিউজিয়াম, প্রথম পাবলিক স্কুল, প্রথম কারাগার, প্রথম রাজধানী এই শহর। দুনিয়ার কোনো শহরেই এত ম্যুরাল আর গ্রাফিতি নাই। আমার ছেলেবউ প্যাট্রিশিয়া রেনে থমাসের ম্যুরাল যখন আমি ফিলাডেলফিয়ার দেওয়ালে দেখি—তখন মনের অজান্তেই বলি—এই শহর আমার, আমি তার হাতের নিচে উবু হয়ে আছি। ১৯৭১ সনে যে রণতরী পাকিস্তানি আর্মির সহযোগিতায় পূর্বপাকিস্তান যেতে চেয়েছিল—সাধারণ বাংলাদেশপ্রেমি মানুষ তার সামনে ব্লকেড তৈরি করেছিল এখানে, এই ফিলাডেলফিয়ায়। এখনও প্যানসলেন্ডিং ঘুরতে গেলে একাত্তরের বন্ধুদের মায়ার গন্ধ নাকে এসে লাগে। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের একটা ভার, কী বলা ভালো একটা শ্লথতা কিন্তু এর জীবনপ্রবাহের মধ্যে থাকেই—যা অনেকের ভালো লাগবে না, লাগে না—কিন্তু আমার ভালো লাগে। ডেমোক্রেসি তো আদতে একটা শ্লথ জিনিস, কিছুটা এলোমেলোও বটে। ফিলাডেলফিয়া সেইসব বিরল শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম এক শহর—যেখানে বিলিওনিয়ার প্রায় নাই বললেই চলে। আজও এই শহরের মূল প্রণোদনা পারিবারিক জোড়াবান্ধা ভাব : এই শহরেই এখনও দেখবেন একটি ঘরের পোর্চে, বা বারান্দায় এক পরিবারের কয়েকপুরুষ একসাথে আড্ডা দেয়, আর ঠাসঠাস করে হাসে; আফ্রিকান কালোরা চুতিয়া আধুনিকতার ধার ধারে না, ফিলাডেলফিয়ার ধারেকাছেই থাকে আদিপন্থী আমিশরা—যারা এখনও বাড়িতে, পাড়ায় বিজলি বাতির বদলে মোমবাতি কুপিবাতি জ্বালে। এই সবকিছুর ভিতর এক ক্লেদাক্ত শহরও আমার লেখায় লকলকিয়ে ওঠে—তেমনই একটা কবিতা এখানে দিয়ে রাখি :

ফিলাডেলফিয়ার শিব

এই এক শহর চাঁদ থেকে ঝরে পড়ে ঘন্টাধ্বনি
আমেরিকার প্রথম চিড়িয়াখানা প্রথম হাজত
সাউথ স্ট্রিটে প্রথম ইটালিয়ান রেস্টোরেন্ট।

প্রথম যে খুচরো পয়সা বেরিয়েছিল ফিলাডেলফিয়ায়
তার ঝনৎকার এখনও বাজে কালো নেইবারহুডের
আকস্মিক জেনট্রিফিকেশনে উপড়ে ফেলা

পুরনো দালানের ঠাঁই বসে পড়ায়।

এখানেই গড়ে উঠেছিলেন নোয়াম চমস্কি
অ্যালেন আইভারসন, কোবি ব্রায়েন্ট, কেভিন হার্ট,
রিচার্ড গিয়ার, র‍্যাবেনের বীজদানা সহ মূল লেখাগুলো
অ্যালান পো লিখেছিলেন এই শহরের কিনার ঘেঁষে।
এই মোকামে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এজরা পাউন্ড আর উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসের
দোস্তি হয় এখানে এই শহরে। পল রবসন ছিলেন এখানে
বেশ কিছুদিন। এখনও জেলে ব্ল্যাক প্যান্থার
মুমিয়া আবু জামাল—আমরা যার মুক্তির জন্য রাস্তায় নামি।

এখানে আপার ডারবি হাই ইস্কুলে বাচ্চারা ৫২টি
ভাষায় কথা বলে, ভ্যালি ফোর্জ পার্কে জর্জ ওয়াশিংটন
একদম জীবন্ত, মনে হবে এই তো
মার্চপাস্ট করে যাচ্ছেন কিছুটা ঢালুর দিকে।
আমেরিকার সংবিধান লেখা হয়েছিল এখানেই।

ওখান থেকেই উঠে আসেন লুই কাহন
বারবার ঘুরে ঘুরে দেখেন—
ঢাকার শেরে বাংলা নগরে সংসদ ভবনের চারপাশে
জলাশয় হলে, বিলের ঘেরাও হলে কেমন লাগবে—
কেমন দেখাবে ঢাকা নগরের কংক্রিটে
যদি শাপলা ফুটে থাকে, কেমন মানাবে তাহলে,
এই শহর কী দয়ায় ভরে যাবে একদিন,
ভেসে যাবে বানের তোড়ে?

লুই কাহন তার পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া
শিশুটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন—
শিশুটি যে ফিলাডেলফিয়ার
আরেক বিপুল আবিষ্কার বাবলগাম চিবুচ্ছিল।

এডগার অ্যালান পো বাল্টিমোরে কী চোখে দেখতে পাননি?
বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের আবিষ্কার করা
স্ট্রিটলাইটের আলো তো ছিল অ্যালান পো'র চোখে।

ফিলাডেলফিয়ায় ৩০ স্ট্রিট রেলস্টেশন থেকে
ট্রেনে চেপে সেই যে গেলেন বাল্টিমোর—আর ফিরে এলেন না।

এত আলো আর অভিমানের শহরেই আছে এক
কেনজিংটন পাড়া—এই আলোকিত নক্ষত্র ক্ষয়ের
করপোরেট দুনিয়ায় শতসহস্র শিবঠাকুরের দিনযাপন
নিশিযাপন পাড়া—হেরোইন, ফেন্টালিন আর কোকেইনের
ঘোরে কাঁপে, ঘুমায়, ঘুম ঘুম কাতরায়—
স্বপ্ন আর জাগরণের পুলসিরাত ফিলাডেলফিয়ার কেনজিংটন।

বিদ্যুতের থিকথিকে অমা পান করে তারা
রাস্তার উপর ছেঁড়া কম্বলের নিচে যৌনমিলনে
ধুঁকে ধুঁকে জ্বলে তারা, নুয়ে রয়,
তমসার হিল্লোলে উড়তে থাকে, দুলতে থাকে,
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে কালের শিবেরা।

তারা খায় নিদারুণ সময়ের কালশিটে ও গন্ধম
ঘুমালে তারা উড়তে থাকে, জাগরণে উড়তে থাকে
আই ৯৫ মহাসড়ক দাবড়ে ছোটে অ্যালান মাস্কের টেসলা

দুনিয়া ঠাণ্ডায় ঘামতে থাকে—গো ফ্লায়ার্স!

এইসব দিঘল ইতিহাসের ছাতিমতলা ডিঙিয়ে ইন্টারস্টেট নাইন্টি ফাইভ দাবড়ে যে-ই হয়তো টেসলা, বা নিসান যায়—আমি বলি : কী বলিবো সোনার চান রে, কী বলিবো আর, এই যে নৌকা ডুবো রে ডুবো, এই নৌকা তোমার—রে দয়াল, কী বলিবো আর!

প্রসঙ্গ ফিলাডেলফিয়া বইমেলা

আশরাফুল আরিফ

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ফিলাডেলফিয়া বইমেলার মূল উদ্দেশ্য হলো এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রাণবন্ত মঞ্চ তৈরি করা, যেখানে প্রবাসী এবং বাংলাদেশের লেখকেরা তাদের সাহিত্যকর্ম উপস্থাপন করতে পারবেন, এবং পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপে অংশ নিতে পারবেন। এই মেলা কেবল বইয়ের আদান-প্রদান নয়—এটি ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য উদযাপনের একটি অনন্য পরিসর। একই সঙ্গে, এটি নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী করে তুলবে এবং প্রবাসে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর করবে।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও পথচলার অনুপ্রেরণা

ফিলাডেলফিয়া বইমেলাকে ঘিরে আমাদের স্বপ্ন সীমিত নয়—এই আয়োজনের ভেতরেই আমরা দেখতে পাই এক বিস্তৃত সাহিত্যিক আন্দোলনের সম্ভাবনা। এখানে জন্ম নিতে পারে একটি মানসম্পন্ন সাহিত্যপত্রিকা, একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, তরুণ লেখকদের জন্য লেখালেখি বিষয়ক ওয়ার্কশপ, এবং বাংলা বইয়ের বিস্তার ঘটানোর নতুন উদ্যোগ। প্রবাসে বেড়ে-ওঠা শিশুকিশোরদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই আমাদের এই প্রয়াস। বইমেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠুক একটি সজীব সাহিত্যিক কমিউনিটি—যা বছরজুড়ে পাঠচক্র, আলোচনা সভা, বুক রিলিজ, শিশুকিশোরদের সাহিত্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সক্রিয় থাকবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, এই মেলা হয়ে উঠবে এক চলমান সাংস্কৃতিক জাগরণ।

উপসংহার

ফিলাডেলফিয়া বইমেলা ২০২৫ কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়—এটি প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক গর্বিত প্রকাশ। এই মেলার মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশকে নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন আলোয় তুলে ধরা সম্ভব, তেমনি বহুজাতিক সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা ও বন্ধনের এক গভীর ভিত্তি রচিত হবে।

মালজোড়া গানের সনতারা বেগম

সরোজ মোস্তফা

কংস-মগরা-ধলাই-সাইডুলি-ধনু-ঘোড়াউৎরার অববাহিকায় সুরে-জিজ্ঞাসায়-পরিবেশনে বাউলের একটা নিজস্ব ধারা ও ঘরানা বহমান। সুরে ও জিজ্ঞাসায় ভাঁটফুলের এই শুভ্র মৃত্তিকা থেকেই উৎসারিত হয়েছে তত্ত্বগানের বিপুল জগৎ। এই মাটিটাই সুরের। ভাবুকের। নেত্রকোনা মূলত নদীবিধৌত হাওরের পাড়। দূর হাওরের হাওয়া ও স্নিগ্ধতা ধান-পাখি-ফুল ও মাছের উল্লাসে এখানে প্রবাহিত। ঝগড়াফ্যাসাদ যে নেই তা নয়। পলিমাটির মাধুর্যে গড়ে উঠেছে এখানকার মানুষের মন। এখানে হাওরপাড়ের ভাবুকেরা, গায়েনেরা, গীতালুরা বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে তাকিয়ে গানে গানে কাহিনি বাঁধেন। লম্বা লম্বা কাহিনিকাব্যের সুরে উঠে আসে ধরা-অধরা মানবচরিত্র। পৃথিবীর সব কাহিনির উৎসে আছে মানুষ। মাটির গুণাগুণে সেই কাহিনিতে তৈরি হয় ভিন্নতা। সেই ভিন্নতার সুরেই এখানে রূপায়িত হয় আলাল-দুলাল, কাজলরেখা, মহুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা।

২

কত যে বিচিত্র এখানকার গানের প্রকার ও প্রকাশ! মাটির নরম থেকেই উৎসারিত হয়েছে এখানকার সুর, সাধু-মহাজনের জীবনপদ্ধতি। দিঘির পাড়ের বেলপাতার মতো নরম ও দরদি এখানকার মানুষের হৃদয়। প্রশ্ন ও সুরযাপনের বিচিত্র শুদ্ধতা থেকেই জন্ম নিয়েছে ভাটি-বাংলার নিম্নভূমির আন্তরিক তত্ত্বগান। প্রশ্নে-প্রশ্নে গানে-গানে এই মাটির সাধু মহাজনেরা জ্ঞানের কথা প্রচার করেন। সুর ও জিজ্ঞাসার এই প্রদীপ্ত ধারাকে মহামতি জালাল উদ্দিন খাঁ মগ্ন-প্রাচুর্যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। আসরে দাঁড়িয়ে সুরে-জ্ঞানে জগতকে, মানুষকে, সৃষ্টিকে, স্রষ্টাকে, ইহকাল-পরকালের রূপ-রূপান্তরকে জিজ্ঞাসা করছেন। বাংলার কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষেরাই এই

গানের শ্রোতা। এরা 'শিক্ষিত' মানুষজনের দুর্মর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। শহরের ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের বাইরে এঁরা দরদি ব্যক্তিত্বে, মুক্তজ্ঞানে এই জিজ্ঞাসার জ্ঞানমাধুর্যকে গ্রহণ করেন।

তত্ত্বগানের এই মহৎ ঘরানায় নিজের নাম লিখিয়েছিলেন সনতারা বেগম। সময়টা আশি-নব্বইয়ের দশক। নেত্রকোনার ভাটির তল্লাটে এমন কোনো মানুষ নেই যে সনতারা বেগমের নাম শোনেননি। মূলত তিনি গায়িকা। আসরের মালজোড়া গানের শিল্পী। সহজ বুদ্ধিতেই মালজোড়া গানের আসরে অবতীর্ণ হতেন। সনতারা বেগম এবং উকিল মুন্সির নাতনি আলেয়া বেগম সেসময় মালজোড়া গানে এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছেন। নেত্রকোনায় কে প্রথম নারী বাউল শিল্পী—এই প্রশ্নের মীমাংসা করা বেশ কঠিন হবে। কারণ এই দুইটা নাম পাশাপাশি সময়ে লোকমুখে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। দুজনেই পাশাপাশি সময়ে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। কী জনপ্রিয় যে তারা ছিলেন! আজাদ-সনতারা বেগম এবং আলেয়া বেগমের মালজোড়া গানের ডাক উঠলে দর্শক ধারণের ঠাঁই সংকুলান হতো না। এই অঞ্চলের মানুষ টিকিট কেটেও তাদের মালজোড়া শুনেছে। তারপর পিরের নিষেধে আলেয়া বেগম চলে গেছেন লোকচক্ষুর আড়ালে। আর সনতারা বেগম ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় পরলোকবাসী হয়েছেন।

৩

ধারণা করা হয় বাংলা ১৩৭৬ সনে তিনি জন্মেছেন। আটপাড়া উপজেলার দেওগাঁও গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। তাঁর পিতা সৈয়দ সোনাফর শাহ ওরফে পোড়া শাহ ছিলেন একজন ফকিরপন্থী সাধক পির। সাধকের বাড়িতে পিরসাধুদের স্বাভাবিক গমনাগমন ছিল। ছিল বাউলদের আন্তরিক আনাগোনা। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে গানের জলসা হতো। বাউলপন্থীরা ফকিরপন্থীরা সেখানে নিজেদের গান পরিবেশন করতেন। গানের এরকম একটি সহজে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সনতারা বেগম। জলসা গানে স্নাত হতে হতে একদিন তিনি বাউল গানে আত্মপ্রকাশ করেন। পিতার নিষেধ ছিল না। তাই সহজেই গানের জগতে নাম লেখাতে পারলেন। অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় দ্রুত তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সময়টার কথাও একবার ভাবুন, আজ থেকে ৪০ বছর আগে একজন কুমারী নারী জলসার গান গাইতে, তত্ত্বগান গাইতে আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন—

স্বাভাবিকভাবে দর্শকদের মধ্যে এ-নিয়ে প্রবল আগ্রহ থাকবে। এবং তা-ই হয়েছে। মানুষের ঢল নেমেছে তাঁর আসরে।

মানুষেরা সনতারা বেগম বলত না। ছোট্ট করে বলত, সনতারা। 'আজ সনতারার গান আছে'—এই কথা শুনলে ছেলে-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সবাই গানের আসরে হাজির হতো। আসরের গান গাইতে গাইতে তিনি আসরের শিল্পী হয়ে গেলেন। মালজোড়া গান একা গাওয়া যায় না। গাইতে গাইতে একসময় খাটপুরার বিখ্যাত বাউলসাধক চান মিয়া সাহেবের ছেলে বাউল আজাদ মিয়ার সঙ্গে তাঁর জুটি হয়ে যায়। লোকের মুখে প্রচারিত হতে থাকে আজাদ-সনতারা জুটি। আসরে-জলসায় গানে গানে প্রেমের উন্মেষ। প্রেম থেকে বিয়ে।

বিয়ের পরেই তাঁর শশুর বিখ্যাত বাউলসাধক চান মিয়া সাহেবের কাছে মালজোড়া গানের তালিম গ্রহণ করেন। শিখতে থাকেন গানের জ্ঞান, রীতি ও পদ্ধতি। সাধনা ও আন্তরিকতায় সনতারা বেগম এই জনপদের মানুষের মুখে মুখে ছিলেন। তিনি নিজে গান লেখেননি। তাঁর শশুর চান মিয়া সাহেবের গান গেয়েছেন। তাঁর স্বামী আজাদ মিয়া সাহেবের গান গেয়েছেন। মূলত আজাদ মিয়ার উৎসাহ ও প্রেরণাতেই মালজোড়া গানের বিখ্যাত শিল্পীতে পরিণত হন সনতারা।

আজাদ-সনতারা জুটির কোনো তুলনা হয় না। এই জনপদের মানুষের মনের মণিকোঠায় তাদের স্থান। তারপর আজাদ মিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদে তাঁর অনেককিছু শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংসারে আর তেমনভাবে গান গাওয়া হয় না। কমে যেতে থাকে গানের বায়না। জুটির মৃত্যু হলে জুটির শিল্পীবৃন্দকেও মানুষ আর তেমন পছন্দ করে না। তারপরও তিনি গান ছাড়েননি। ডাক পেলেই আসরে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু সমাজ থেকেই যেখানে গান মরে যাচ্ছে সেখানে সনতারাকে আর কে গানের জন্য ডাকে? তারপরেও দু-একটি ডাক আসে, আন্তরিকতার সঙ্গে সেসব আসরে নিজেকে ঢেলে দেন সনতারা।

৪

২০১৬ সালে তাঁর সাথে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়। বড় স্টেশন সংলগ্ন কেডিসি গুদামের পাশে ছোট্ট একটি চায়ের দোকানে কথা হয়। আত্মজীবনের কথা, আত্মপরিচয়ের কথা। গুরুর কথা। চান মিয়া সাহেবের কাছে কীভাবে গান শিখেছেন সেই কথা। বললেন, আজ আব্বার ওরস।

প্রতিবছর ফাল্গুনের ১৭-১৮-১৯ তারিখে এই তিনদিনভরা আব্বার ওরস অনুষ্ঠিত হয়। কথায় কথায় বলি, চলেন আজকে আপনার গুরু চান মিয়া সাহেবের বাড়ি যাই। ওরসে যাই। তিনি বললেন, তাঁর সাথে (বাউল আজাদ মিয়া) তো আমার বিচ্ছেদ হইছে। তাঁর সাথে দেখা হয় না। তিনি আমার সাথে কথা বলেন না, আমিও কথা বলি না। চলেন আপনারা বলতেছেন যাই। সেদিনের সে-কথামালায় উপস্থিত ছিলেন কবি আহমেদ স্বপন মাহমুদ। কথাবলার সূত্র ধরেই সেদিন সন্ধ্যায় চুচুয়া বাজার সংলগ্ন খাটপুরায় চান মিয়া সাহেবের ওরস মোবারকে হাজির হই। স্বপনভাই ভক্তদের জন্য তবারক হিসেবে জিলাপি কিনে নিয়েছিলেন। সারারাত ছিলাম। মচ্ছবের খাদ্য গ্রহণ করেছি। দেখেছি ভক্তবৃন্দের গান ও প্রার্থনা। নারী-পুরুষের সম্মিলনে রাতের গানের আসরে দেখেছিলাম বাংলার মরমের এক আদিরূপ।

শ্বেতশুভ্র-নির্মল শাড়িতে হাজির ছিলেন সনতারা বেগম। বেহালা বাজিয়ে তাঁর গুরু শ্বশুরসাহেবের গান করছিলেন। মাজারের রূপালি ঝালরের মতো চকচক করছিল প্রেম ও দরদ। বোঝা যাচ্ছিল গানে গানে তিনি সমর্পিত হচ্ছেন। প্রকৃত নিবেদনে একটা স্নিগ্ধতা থাকে—সেই স্নিগ্ধতা সবাইকে স্পর্শ করে। সনতারা বেগমের দরদ ও স্নিগ্ধতাই আমাদেরকে স্পর্শ করেছিল। কারণ তাঁর কণ্ঠে সুর ছিল না। রাতজাগার গাঢ় কুয়াশায় কণ্ঠ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু গানটা খুব ভালো লাগছিল। যেভাবে তিনি গাইছিলেন, মনে হচ্ছিল, কণ্ঠ থেকে নয়, অন্যত্র থেকে এই সুর নামছে। মালজোড়াগানের প্রবীণ গায়িকা আজ সুরে সুরে সবাইকে ভিজিয়ে রাখবেন। মনে হচ্ছিল মালজোড়াগানের একটা আসরেই হাজির হয়েছেন তিনি।

তিনি গাইছিলেন :

তোর বুকে থাকিয়া পাইলাম বেদনার ব্যথা
তোর সনে কিসের মায়ামমতা।
সাধের দুনিয়া, তোর সনে কিসের মায়ামমতা॥

আগে যদি জানতাম আমি তুমি যে বাসিবে ভিন
তবে কি আর খেটে খেটে এই দেহ করতাম মলিন
ফুরাইয়া গেল গনার দিন খাইয়া লাথিগুতা।

তুই যে এত ভেল্কি জানিস আগে যদি জানিতাম
তবে কি মানবকুলে তোর বুকেতে আসিতাম গো (২)
পশু হইয়া দিন কাটাইতাম খাইয়া গাছের পাতা।

না লাগিত বেহেস্ত-দোজখ না হইত আচারবিচার

ইচ্ছামতো বেড়াইতাম কারণ না ছিল চিন্তার গো (২)
পুলছেরাত না হইতাম পার শুনতাম না কারো কথা।

হাতি-ঘোড়া হইতাম যদি লাগিতাম কোন কাজে
আমার ঘাড়ে চইড়া মানুষ বেড়াইত মাঝেমাঝে (২)
চান মিয়ায় কয় বুঝেসুজে চামড়ায় বানাইত জুতা।

গানটি সাধক-পুরুষ বাউল চান মিয়া সাহেবের।

৫

এরপরে আরো কয়েকবার তাঁর সাথে কথা হয়। দু-একবার তিনি নেত্রকোনা কলেজের বাংলা বিভাগেও এসেছেন। তাঁর ছেলে হাবিব বাউলাকে নিয়ে প্রায় পুরোদিন একটি গানের ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলাম। বারীণ ঘোষকে যারা জানেন তারা বুঝতে পারেন বারীণ ঘোষের সাথে কাজ করা কতটা কঠিন। কোনো-একটা বিষয়ে প্রস্তুতি নিতেই তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। সেই বারীণ ঘোষের ক্যামেরায় কলেজের পুকুরপাড়ে তালগাছতলায় সনতারা বেগমের গান ভিডিও করা হয়েছিল। পরে বারীণ ঘোষকে অনেকবার বলার পরেও সেই ভিডিও আর পাওয়া যায়নি। মনে হয় শিল্পীর খেয়ালে এই ভিডিও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ভিডিও থাকলে ভালো হতো, তাহলে জগতসংসার বাংলার মালজোড়া গানের এক মহৎ শিল্পীকে চিনতে পারতেন, বুঝতে পারতেন এই মাটির গানের উত্তরাধিকার।

লুইস গ্লুকের একগুচ্ছ কবিতা

আল ইমরান সিদ্দিকী

অমেয়

এক গ্রীষ্ম ছিল
যে বারবার ফিরে এসেছে
এক ফুল ছিল, যা একেক সময় একেক ভঙ্গিতে ফুটেছিল।

মোনার্ডা ফুলের ক্রিমসন রং, দেরিতে ফোটা গোলাপের ম্লান সোনালি রং

এক ভালোবাসা ছিল
এক ভালোবাসা ছিল, অনেক রাত ছিল
মক অরেঞ্জ গাছের গন্ধ

জুঁই এবং লিলির করিডোর
তখনও বাতাস বইছে।

অনেক শীতকাল ছিল, কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করেছিলাম
দ্রবীভূত ডানা সহ শীতল সাদা বাতাস ছিল।
একটা বাগান ছিল যখন তুষার গলতো
আকাশি এবং সাদা; আমি বলতে পারিনি
ভালোবাসা থেকে আমার নির্জন দূরত্বের কথা—

এক প্রেম ছিল; তার অনেক কণ্ঠস্বর ছিল
এক ভোর ছিল; কখনও কখনও
আমরা একসাথে সে-ভোর দেখেছি

এখানে ছিলাম আমি
এখানে ছিলাম আমি

এক গ্রীষ্ম ছিল, যা বারবার ফিরে আসছিল
এক ভোর ছিল
দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলাম।

মক অরেঞ্জ

শোনো বলি, চাঁদ নয়
ওই ফুলগুলিই মূলত বাগান আলো করে রাখছে।

ঘৃণা করি আমি তাদের।

ঘৃণা করি ওই ফুলগুলিকে, যেমন
ঘৃণা করি আমি যৌনমিলন—
একজন পুরুষের মুখ আমার মুখকে সিলগালা করে দিচ্ছে—
শরীরকে অবশ করে দেয়া পুরুষের শরীর।

ওদিকে কান্না কেবল নিজেকে লুকিয়ে ফেলে—
যৌথতার কী হীন, অবমাননাকর ভিত্তি!

নিজের অন্তর্দেশে, আজ রাতে, আমি শুনতে পাই
প্রশ্ন আর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর
ক্রমাগত জলের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠছে
আর ধ্বসে গিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ছে পুরনো সব পরিচয়ে, সত্তায়।

ক্লান্তিকর প্রতিহিংসা। দেখোনি তুমি—

আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছে
আর জানালা দিয়ে গন্ধ ভেসে আসছে মক অরেঞ্জ ফুলের।

কীভাবে শান্ত থাকবো, বলো?
কীভাবে স্বস্তিতে থাকা যায়
যখন পৃথিবীতে আজো এমন অসহনীয় গন্ধ থেকে গেছে?

নকটার্ন

কাল রাতে মা মারা গেছে,
মা কখনো মরে না।

বাতাসে ছিল শীত,

অনেক মাস দূরে
কিন্তু তবুও বাতাসে শীত ছিল।

সেদিন মে মাসের দশ তারিখ ছিল।
হাইসিন্থ এবং আপেল ফুল
ফুটেছিল পিছনের বাগানে।

আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম
চেকোস্লোভাকিয়ার গান গাইছে মারিয়া—

'আমি কত একা'—
এরকমই একটা গান।
'আমি কত একা',
মা নেই, বাবা নেই—
তারা নেই বলে মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

পৃথিবী থেকে সুগন্ধ মুছে গেছে;
বাসনকোসন বেসিনে ছিল,
ধোয়া হয়েছে কিন্তু গুছিয়ে রাখা হয়নি।

পূর্ণিমার নিচে
মারিয়া ধোয়া কাপড়গুলি ভাঁজ করছিল;
বিছানার মোটা চাদর যেন
চাঁদের আয়তক্ষেত্রাকার শুকনো সাদা আলো।

'আমি কত একা, কিন্তু গানে
আমার নির্জনতাতেই আমার আনন্দ।'

সেদিন ছিল মে মাসের দশ তারিখ
নয় বা আট তারিখের মতোই একটা দিন।

মা তার বিছানায় শুয়েছিলেন,
তার হাত প্রসারিত, তার মাথা
প্রসারিত দুই হাতের ঠিক মাঝ বরাবর।

উপবিষ্ট শরীর

মনে হচ্ছিল, তুমি যেন হুইলচেয়ারে বসে থাকা একজন মানুষ
যার পা হাঁটু অব্দি কাটা।

কিন্তু আমি খুব করে চেয়েছিলাম তুমি যেন হাঁটো।
আমি চেয়েছিলাম, গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়
হাতে হাত রেখে হাঁটতে,
এবং সেই চাওয়া আমার কাছে এতটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে যে,
আমি চুপ থাকতে পারিনি, আমাকে কথা বলতে হয়েছে,
দাঁড় হবার জন্য তোমাকে চাপ দিতে হয়েছে।—

কেন আমাকে তুমি কথা বলতে দিলে?
তোমাকে নিয়ে এগিয়ে যাবো বলে
আমি তো তোমার নীরবতাকে নিয়েছিলাম,
যেমন নিয়েছিলাম তোমার মুখের যন্ত্রণাকে।
মনে হচ্ছিল—
আমি চিরতরে দাঁড়িয়ে আছি, নিজেরই হাত ধরে।

এবং পুরোটা সময় জুড়ে, আমি যা-কিছু দেখেছি
তা যতটা আমি গ্রহণ করতে পেরেছি, তার থেকে বেশি

নিরাময় তুমি নিজেকে এনে দিতে পারতে না জেনো।

মায়া সারিশবিলির কবিতা
ভাবতর্জমা : **মঈনুস সুলতান**

বয়সে তরুণ জর্জিয়ার কবি মায়া সারিশবিলি ‘মাইক্রোস্কোপ’ নামে একটি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে পরিচিতি পাচ্ছেন আজকাল, যা সাবা লিটারারি অ্যাওয়ার্ড ফর পোয়েট্রি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে সম্প্রতি। তিনি কয়েকটি বেতারনাটকেরও প্রণেতা। তাঁর বেশকিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে গোয়ারনিকা, প্লুম, অ্যাশভিল পোয়েট্রি রিভিউ, ন্যাশভিল রিভিয়্যু ও লস অ্যাঞ্জেলস্ রিভিয়্যু প্রভৃতি জার্নালে। তিনি গতায়ু সোভিয়েত আমলের সাবেক প্রজাতন্ত্র জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসিতে বসবাস করেন।

‘শিশু’ ও ‘কবিতা’—বলা চলে, এ-দুটি বিষয় কবি মায়া সারিশবিলির দিনযাপনকে স্পষ্টত ভরপুর করে রেখেছে। পেডাগোজিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চারটি শিশুসন্তানের জননী এ শব্দের করিগর একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে হালফিল কাজ করছেন। প্রচুর ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাব্যসম্ভার মুসাবিদা করা থেকে বিরত হন কদাপি। বিশাল একটি একান্নবর্তী পরিবার, পেশাদারী জীবন এবং শিল্পের প্রতি তাঁর ওয়াদার ভেতর হরহামেশা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন তিনি। তুমুল প্রাণশক্তির অধিকারী এ তরুণী তাঁর অশেষ সৃজনশীলতা দিয়ে যুগপৎ গৃহ ও বিদ্যালয়ে শিশুদের দিনযাপনকে আকর্ষণীয় করে রাখছেন অহরহ।

সারাদিন সংসারে নিমজ্জিত থেকেও তিনি নির্ধারিত করে রাখেন সামান্য সময় রজনির মধ্যযামে—যখন যাপিত দিনের আদনা কোনো বিষয়, অথবা বিরল কোনো আনন্দ তাঁর লেখনীর যত্নে হয়ে ওঠে কবিতার জাদুময় অভিব্যক্তি। কবিতাকে নির্মাণ করেন তিনি নিত্যদিনকার পাগলামোর তালিকা হিসাবে। আর তাতে যুক্ত করেন শব্দছন্দের ক্যারিশমায় নিজস্ব ইমোশনের সারাৎসার।

উপস্থাপিত বায়োর মূল রচয়িতা ইনগ্রিড ডেগরেভে, জর্জিয়ান ভাষা থেকে ইংরেজিতে এই বায়ো অনুবাদ করেছেন জন আয়রন্স।

এভাবে কাজ হয় না কিছু

এভাবে বিষয়টি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়,
সম্পূর্ণ বনভূমিকে তুমি যদি ধুলিস্যাৎ করে দাও—
ঘটনাটি হবে বাড়াবাড়ি অতিশয়,
একটি শিকড়ও কেউ খুঁজে পাবে না কোথাও।

পৃথিবী থেকে বিযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে দুঃস্বপ্ন বিশেষ,
শহরগুলো ভাসতে থাকবে ত্রিশঙ্কু শূন্যতায়—
সমুদ্রের জলধিতে তাদের ছায়া পড়বে অতিকায়,
তথ্যশিকারিরা লেখাপড়ায় করতে পারবে না অভিনিবেশ।
সমুদ্র উবে গিয়ে তৈরি হবে কাচের ঝিকমিকে বালুচর,
ব্রহ্মাণ্ড থেকে নাড়িছেঁড়া হয়ে পৃথিবী যখন তছনছ হবে—
চাঁদের গিরিকন্দরে কী গড়ে উঠবে বাসযোগ্য ঘর?

গ্রহটি ভেসে ভেসে আজ যেন দূরে চলে যেতে থাকে,
তিমিমাছগুলো আটকে পড়ে চরের জলজ পাঁকে—
বিপুলকায় ধারালো খুরের মতো ঘষা খেতে খেতে
পৃথিবী ঘুরতে থাকে নিয়ন্ত্রণহীন,
নিরাপদ বসবাসের অভ্যাসে আমরা যারা অর্বাচীন,
নিদারুণ উৎসাহে বস্ত্রাদি খুলে হই স্রেফ নগ্ন,
শরীর থেকে খুলতে থাকি শিরা-উপশিরা—
আমাদের হৃদয় সবকিছু হারিয়ে হতে থাকে ভগ্ন।

অতিসত্বর সৃষ্টি হয় এমন এক পরিস্থিতির,
সিরামিকে তৈরি শিশুদের শরীরে হুল ফোটাতে
ব্যর্থ হয় মৌমাছির ঝাঁক—তারা গুঞ্জন তোলে অধীর।
এভাবে কাজ হয় না কিছু—এসব ভাবনা আদতে বন্য,
বাচ্চাদের তো গড়া হয়েছে গ্র্যান্ড পিয়ানোর ডালায়
ডিসপ্লে করার জন্য!

দম ফেলতে কষ্ট হওয়ার ধ্বনি

নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে নিদারুণ
শুনতে পাও কী আমার দৈহিক সংগ্রামের শব্দ?
রাত গভীর—আমার কামরার হালত এমন অগোছালো করুণ,
সবকিছু নিথর—কেমন যেন স্তব্ধ।
কুমারী কন্যা এক—পরিণত হয়নি সে বয়সের খরতাপে
আচরণে তার তৈরি হয়নি কোনো মুন্সিয়ানা,
কীভাবে মোকাবেলা করবে বলো ঝড়ের কাণ্ডকারখানা!

পর্দাও আড়াল করতে পারে না

তোমার মুখের ওপর হামলে-পড়া অনভিপ্রেত হাসি,
জানালা গলে আসা তীব্র আলোও সহ্য হচ্ছে না
ভ্যাপসা গরম—খাবারের স্বাদও ঠেকছে বাসি।
নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে নিয়নের ধারালো আলোয়
গ্রীষ্মঋতুতে মিশে যাচ্ছে শীত,
ঝলমলে বিজ্ঞাপনের চৌকস শব্দে চূর্ণিত হচ্ছে শোণিত।

অক্ষরগুলোও আমাকে আজ করুণা করছে
সারি বেঁধে দাঁড় করিয়েছে বোকার হদ্দ একদল ক্রীতদাস,
বাধ্য করছে তাদের ভোর অব্দি ক্রমাগত চিৎকার করতে
গলায় রজ্জু বাঁধা হয়ে শ্বাসকষ্টে তারা করছে হাঁসফাস।

দুধের সফেদ গ্লাসটি প্যাঁচিয়েছে কালো কাপড়ে
যেসব দ্রব্য অভঙ্গুর—এ-রকম প্রতিটি জিনিসপত্র,
এমনকি ঠিকানা লেখার নোটবুকটিও মোড়া সুতি কাপড়ে
অগোছালোভাবে ছড়ানো সবকিছু যত্রতত্র।
আর সেখানে অক্ষরের অবাস্তব শিষ্টাচারে,
বান্ধবরা হাত নেড়ে জানাচ্ছে বিদায় সম্ভাষণ
দাঁড়িয়ে থাকি নির্বাক—বদ্ধ ঘরের রুদ্ধদ্বারে।

ঝড়ে তৈরি হচ্ছে উন্মাদনা

ঝড় সাজাচ্ছে আজ উন্মাদনার নকশা
তছনছ হচ্ছে তাবৎ নিখিল,
সৃষ্টি করছে ভিন্নতর শৃঙ্খলা
সারির শেষে দাঁড়িয়ে শিশুরা
ছন্দের ভেতরে হাসছে অন্ত্যমিল।
একটি কবিতার সূত্রপাত হয়েছে প্রতিবাদে
যা পূর্ণিমার কিরণে চন্দ্রাহত,
আমার হাসিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে উপেক্ষায়
উড্ডীন ডানা হয়েছে বিক্ষত।
বেসামালভাবে এলোমেলো হয়েছে আমার পালক
পারি না ডানাটি আর উঠাতে
তিরোহিত হয়েছে উড়ালের গতিময় ঝলক।

মানুষের দঙ্গল ছুটে এসে পদদলিত করে আমার ওষ্ঠ
ভাবি—আমার যত না-করা পাপ,
ভিড়ে ভারাক্রান্ত হতে হতে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে খারাপ।
চোখ তুলে উপরের দিকে তাকাই আমি—
বিন্দু বিন্দু জমে আছে মিনিয়েচার মেগাফোনের মতো
তোমাকে আজ ছুঁতে চাই হে অন্তর্যামী;
তাড়া করি আমি প্রতিটি ত্রিশঙ্কু বিন্দুকে
আর পাঠ করি আমার কবিতা
কিছু ম্লান গাথা জড়ো করে রাখি সিন্দুকে।
বিষয়টি বেজায় বেখাপ্পা—
একটি বিন্দুও তার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে না আমার মহলে,
পিচ্ছিল হয়ে-ওঠা মঞ্চ এক
স্মৃতিতে ফিরে আসে বিচিত্র এক ছলে।

অতঃপর ভাবি একটি ঘরের কথা—
রকমারি জিনিসপত্রে ঠাঁই হচ্ছে না এ-রকম,
যেখানে কোনো এক সময়...বুঝিবা সে-মুহূর্ত ছিল প্রার্থিত পরম,
শৈশবে বোকার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম একাকী
কাছে ছিল না কোনো ধাত্রী,
জননী আমার সেদিন ছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী,
টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম টেবিলের উপর
যাতে কাছ থেকে ঈশ্বর শুনতে পান আমার কণ্ঠস্বর।

নতুন দিন

নতুন দিনগুলো বেনোজলের হ্রাসবৃদ্ধির মতো উঠে-নামে
নগরীতে নামছে বিকাল,
দূর থেকে তুমি তাকিয়ে দেখো
পার্কে বাদক এক খিন্ন মনে বাজায় ঝাঁপতাল,
জনপ্রবাহ চলে ডানে ও বামে।

নগরীর ফুলদানিতে পাপড়ি-মিইয়ে-আসা এক ইকেবানা,
ফুটপাতে সারাক্ষণ চলে মানুষের আনাগোনা।
সরুজ ডোবে—আসমানে লেগে থাকে বেলাশেষের অস্তরাগ,

প্রতিবেশীরা সরায় জানালার পর্দা
দুটি মানুষের রেখা কাছাকাছি হয়ে মাখে ভালোবাসার পরাগ।

দূর থেকে আমি স্পষ্টভাবে অবলোকন করি তাকে
যে জীবনের তাবৎকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় জর্জরিত,
যার ছায়ারূপ দেখা যায় জানালার শিকের ফাঁকে
পরিবারের ছেঁড়াখোঁড়া সদস্যদের মন রিফু করে দিয়ে
হামেশা যে হয় প্রীত।

জানালা দিয়ে আমি তাকে আবারও করি পর্যবেক্ষণ
যে জানে না গন্তব্য তার কোথায়
দু-হাতে মুখ ঢেকে বুঝিবা অঝোর কান্নায়
ভেঙে পড়ছে সে এখন।

অই আনন্দের কথা

কামরার দুয়ারে অর্গল ছিল পুরোপুরি বন্ধ
রঙের পালিশ মেখে নোখে—
বসে ছিলাম তার কোলে,
ওখানে ছিল কেবলমাত্র অই আনন্দ
কমলালেবুর বাকল চিপে সে রস ফেলেছিল আমার দু-চোখে।

অন্যমনস্কভাবে সিগ্রেট ধরিয়ে
আমার সাথে সক্রিয় হওয়া সে স্রেফ বন্ধ করে দিলো,
চোখ-ঢেকে-দেয়া চুলের গুচ্ছ সরিয়ে
আমি তাকাই, শরীর নাড়াচাড়া করতেও কষ্ট হচ্ছিল।

ঘষটিয়ে আমি তার কোল থেকে আসি নেমে

তার জুতোতে ছোঁয়াই আমার গণ্ডদেশ,
সময় বয়ে যায় নিরাময়হীন বিক্ষত প্রেমে
কেউ করে না কোনোকিছুতে অভিনিবেশ,
অতিথিদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে টেবিলের তলায়,
অন্য কামরায় স্ফূরিত শব্দাবলি কী-রকম ভিন্ন শোনায়,

পাশের দমবন্ধ কুঠুরিতে জড়ো হওয়া মেহমানদের উচ্চারণ,

সবাই যেন ভ্যাপসা গরমে অন্য কারো সাথে করছে রমণ।
চোখে লেগে থাকে কমলালেবুর বাকলের শুকা রস
মনে তৈরি হয় না এমন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব,
মুখে আমি বুলাইনি মেকাপের বর্ণিল পরশ
অইদিন কেবলমাত্র ওটাই ছিলো আমার আনন্দ।

অনভিপ্রেত শব্দের অভিঘাত

ঘুমানোর আগে আমার সত্তা থেকে মুছে নেই প্রতিটি বাক্য
যা শুনেছি সারা দিনভর—ডিলিট করি অজস্র শব্দের অভিঘাত,
জ্বরতপ্ত রোগীরা যে-রকম ডিলিরিয়ামের ঘোরে করে প্রাণাতিপাত
থার্মোমিটার ঝাঁকিয়ে নামিয়ে আনতে চায় পারদের পরিসংখ্যান,
আমিও রোধ করতে চাই অনভিপ্রেত শব্দের ভেসে-আসা বান।

মিথ্যাচারের বিপুল উত্তাপে বলকায় পারদ—বিপন্ন হয় বোধ
খাঁটি কণ্ঠস্বরের নীরবতা আমার মাঝে সঞ্চার করে ক্রোধ।
ডিমের খোসা ছাড়ানোর মতো খুলে নেই বেফজুল শব্দের বাকল,
বিস্মৃত হই—বাকচাতুর্যে কামিয়াবি হওয়ার বারোয়ারি ছল।
চেতনার নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছতে হলে চাই মেধার যানবাহন,
ভুলে যাই—অনেকেই তাতে নিতে পারে না যথাসময়ে আসন।

জামাকাপড়ের পার্টি-পরব

দেখো—জামাকাপড়গুলো সব চলে এসেছে পরবে
তোমাদের পরে নিয়ে তলায়—
খুব জাঁক করে বসেছে তারা—ছড়াচ্ছে হরেক রঙ সরবে।
সাদা বলগাউনের সাথে রেলা করছে গেবার্ডিনের ব্লেজার,
কাজুবাদামের দঙ্গল ছুটছে দিগবিদিক
হন্যে হয়ে ছুটছে তারা—দিশেহারা অপার।

চীনেমাটির বর্তনে পড়ে আছে বেশুমার জিহ্বা
উজ্জ্বল রঙে রাঙানো ঠোঁট,
থুতনির নড়াচড়ায় তৈরি হচ্ছে নানা কিসিমের ছন্দ
চিবানোর শক্তপোক্ত দাঁত খুঁজছে আখরোট।

ক্যান্ডি প্যাঁচানোর মোমঘষা কাগজে আমি

মুড়ে দেবো আমার ডুবন্ত অতীত অতিসত্বর,
দিবসের প্রতিফলন শেষে—বিশ্বাস রাখো
নতুন আমোদে ভরে উঠবে তোমার ঘর।

জীবনের বায়োস্কোপ থেকে কেটে নিয়ে একটি দৃশ্যপট
ঢলে-পড়া নারীরাও হবে না বঞ্চিত,
নোনাধরা দেয়াল ফুঁড়ে গজাবে বট
স্রেফ ভুলে যাব—এতকাল যা করেছি সঞ্চিত;
বিষণ্নতায় যারা ভুগছে তাদের বিরুদ্ধে কী-বা অভিযোগ,
সেসব নারীদের আরেক ধাপ উঁচুতে নিয়ে যাই কীভাবে
যারা তোমার জন্য পুইয়েছে অশেষ দুর্ভোগ?

অঙ্কুরের উৎসব

কামরার প্রতিটি জিনিসের শিকড়ে ধরেছে পচন
স্বাস্থ্যবান নরোম কুঁড়ির মতো
বড় গোল টেবিল থেকে অঙ্কুর হয়ে গজাচ্ছে
ছোট্টমোট্ট আরেকটি টেবিল,
চেয়ারেরও একই হালত—তার থেকে
বেরিয়ে পড়ছে কুটিমুটি আরেকটি চেয়ার।

দুটি বুককেসের একটি ক্ষয়ে ঝুরঝুরে হতে হতে
রীতিমতো অক্কা পাচ্ছে,
ওখান থেকে জন্ম নিচ্ছে ছোট্ট আরেকটি বইয়ের রেক
তাতে আলপিনের মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য বই
মিনিয়েচার শিশুতোষ সব চশমা,
কামরার কোনায় রাখা মেহগিনির বিশাল পিয়ানোর পা থেকে
বেরিয়েছে ছোট্ট টুকটুকে আরেকটি বাচ্চা পিয়ানো,
আহা—কী মজা!
আর আমি—মালিনী এক—এদের লালন করছি
বাগিচায় ফুল ফোটানোর পরম যত্নে।

আবেদা খানম বালিকা বিদ্যালয়
পাপড়ি রহমান

আমাদের গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার হার যতোটা মন্দ হওয়ার কথা, ততোটা কিন্তু নয়। কারণ করটিয়ার জমিদাররা নিজেদের শান-শওকতের দিকে অত বেশি খেয়াল না দিয়ে, সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন বলে। জমিদার চানমিয়া নিজেই প্রচণ্ড শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর এই অনুরাগের ফলে গ্রামে তিন-চারটা ইশকুল-কলেজ বিদ্যমান ছিল। চানমিয়া সাহেবের বাবার নামে ছেলেদের ইশকুল 'হাফিজ মোঃ আলি উচ্চ বালক বিদ্যালয়'। চানমিয়া সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে 'রোকেয়া ফাজেল মাদ্রাসা'। চানমিয়া সাহেবের ছেলে নওয়াব আলির স্ত্রীর নামে 'আবেদা খানম বালিকা বিদ্যালয়'। আর ছিল উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম কলেজ—'ছাদৎ কলেজ'। এ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন— ইব্রাহীম খাঁ। এই হলো আমাদের গ্রামের তখনকার ইশকুল-কলেজের অবস্থা।

একদিন পৌষ বা মাঘের সকালে উষে (শিশির) সিক্ত হয়ে আছে ঘাস—মনে হয় খানিক আগে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি হয়েছে! আমি অই বৃষ্টির মতো উষে ভেজা ঘাসে পা ভিজিয়ে চলেছি আবেদা খানম বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্দেশে। দাদাজান আমাকে নিয়ে চলেছেন এই ইশকুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন বলে। কারণ ততদিনে দাদাজানের কিনে দেওয়া 'শিশুশিক্ষার' প্রথম থেকে শেষ পাতা আমার মুখস্থ-ঠোঁটস্থ হয়ে গেছে। ধারাপাতের এ-মাথা থেকে সে-মাথা আমি ঝড়বরাসন (না ঠেকে) বলতে পারি। আর আমার এতসব বিদ্যাশিক্ষা দেখে বড়চাচিমা বলেছেন—'এইবার তোর ইশকুলে ভর্তি হওন লাগবো'। ফলে, আমি যাচ্ছি আমার গৃহশিক্ষকের নির্দেশ পালন করতে।

কিন্তু দাদাজানের সাথে আমি কি হেঁটে পারি?

দাদাজান বেঁটেখাটো ছোট গড়নের মানুষ, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে আমার চাইতে বিশ কদম এগিয়ে যান। আর আমি তো দাদাজানের চাইতে আরো ছোট। আমি কীভাবে তার সাথে হেঁটে পারবো? ফলে আমাকে প্রায় দৌড়িয়ে চলতে হচ্ছে। জমিদারবাড়ি ছাড়িয়ে, মসজিদ পেরিয়ে, ব্রিজ ফেলে বিশাল এক মাঠের উপর দিয়ে হাঁটছি আমরা। হাঁটছি তো হাঁটছি। কিন্তু ইশকুলের দেখা আর মেলে না! এদিকে উষে ভেজা ঘাস আমার দুই পা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। আর পা দুটো সামান্য চুলকাতে শুরু করেছে। এখন কি করি আমি? আমার পায়ের স্যান্ডেল উষে ভিজে চপচপা হয়ে গেছে।

হঠাৎ করেই যেন ইশকুলের দেখা পেলাম। একটা বিশাল আঙিনা টিন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর তার ভেতরে হলুদ রঙের বিল্ডিং। এতটাই হেঁটেছি আমি যে আমার পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে।

দাদাজান এইবার আমার হাত ধরলেন এবং নিয়ে গেলেন হেডমিস্ট্রেসের রুমে। আমি রুমে ঢুকেই সামনে রাখা একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম (আসলে এটা টিচারদের চেয়ার। কোনো ছাত্রীর বসার নিয়ম নাই। বড় হয়ে শুনেছি আমার আব্বাও নাকি ইশকুলে ভর্তি হতে গিয়ে প্রথম দিনই বসে পড়েছিল টিচারদের চেয়ারে)।

দাদাজানকে দেখলাম হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আমাকে হাত ইশারা করে বললেন—'এইখানে আইস্যা বসো'।

তাকিয়ে দেখি দাদাজান একটা হাতলওয়ালা চওড়া কাঠের বেঞ্চিতে বসে আছেন। ফলে আমকেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাদাজানের কাছে গিয়ে বসতে হলো।

চওড়া কালোপাড় ও সাদারঙের শাড়ি পড়ে একজন বড়চাচিমা গোছের মহিলা বেশ বড়সড় একটা চেয়ারে বসে আছেন। তিনি যেন দাদাজানকে কি কি জিজ্ঞেস করলেন আর দাদাজানও উত্তর দিয়ে গেলেন।

দাদাজান তার টাকাপয়সা রাখেন একটা বটুয়ায়। বটুয়ার ফিতা দিয়ে সেটা ভালো করে কোমরে বেঁধে রাখেন। দাদাজানকে দেখলাম বটুয়া খুলে টাকাপয়সা বের করতে। তারপর একটা কাগজে কি কি যেন লিখে দিলেন। বড়চাচিমা গোছের মহিলাকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো। এবার তিনি আমার দিকে ফিরলেন—
'দুইয়ের ঘরের নামতা বলো তো খুকি?'

আমি প্রথমে সামান্য ভয় পেলাম। তারপর নিচু স্বরে গড়গড় করে বলে গেলাম।

তিনি দাদাজানের দিকে ফিরে বললেন, 'নাতনীর মাথা তো বেশ পরিস্কার'। 'মাথা পরিস্কার'—এ কথার মানে কি?

গতকাল অবশ্য বড়চাচিমা আমাকে দলাই-মলাই করে গোসল করিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে আমি বাড়িতে যাওয়ার জন্য উছপিছ করছি। আমার ইশকুলের গল্পটা কত তাড়াতাড়ি সবাইকে বলতে পারবো? কিন্তু দাদাজান অই আপার সাথে এমন গল্প জুড়েছেন যে উঠতেই চাচ্ছেন না! দাদাজানকে আমি লুকিয়ে বেশ কয়েকবার টানাটানি করলেও তিনি উঠলেন না। দীর্ঘ গল্প শেষ করেই তিনি উঠলেন।

দাদাজানের সঙ্গে আমি যখন বাড়ি ফিরছি তখন ঘাসের উষ আর আগের মতো আর্দ্র নাই। ফলে হাঁটতে হাঁটতেও পা আর ভিজে উঠছে না। কিন্তু জমিদারবাড়ির সামনে আসতেই ফের ফাঁপড়ে পড়লাম। দাদাজান আর আমাকে দেখে একপাল রাজহাঁস ক্ব ক্ব করে তেড়ে এল। আমি দাদাজানের হাত ছাড়িয়ে দিলাম এক দৌড়। দৌড়ে গিয়ে পড়লাম ল্যান্টেনা ফুলের ঝোপের উপর। এই ঝোপ কাঁটায় ভরা। ফলে মুহূর্তে একেবারে আমার হাত-পা ছড়ে গেল। দাদাজানও কি রাজহাঁসদের কামড়কে ভয় পায়? নইলে সে কেন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে? আর 'হেইট' 'হেইট' করে হাঁসের দলকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বেয়াদব হাঁসের দল দাদাজানকে একেবারেই পাত্তা দিলো না।

ইশকুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনেই এই উপদ্রব।

আমি স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ভয় পেলাম। দাদাজানের তো কিচ্ছুই হয় নাই। হাত-পায়ে কাঁটার খোঁচা আমিই খেয়েছি। তবে এটুকু বুঝতে পারলাম ইশকুলে যাওয়া-আসার পথে এই হাঁসের দঙ্গল আমাকে প্রায়ই বিপদাপন্ন করবে।

সামান্য পরে রাজহাঁসের দল লেজ নাড়িয়ে পুকুরে নেমে যেতেই আমার মন খুশিতে ভরে গেল! জমিদারদের সমস্ত জায়গা জুড়েই নানান ফুল-ফলের গাছ। সারিসারি নানা রঙের পাতাবাহার। সেসবের পাশে ঘন্টাফুল। বান্দরলাঠি। কৃষ্ণচূড়া। স্থলপদ্ম। রক্তজবা। ঝুমকাজবা। এই রকম নানান ফুল একেবারে খিলখিলিয়ে হেসে আছে।

দাদাজানের হাত ধরে ফের বাড়ির পথ ধরলাম।

ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাজহাঁসের দাবড়ানি খাওয়ার কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলাম।...

গান নিয়ে

বিজয় আহমেদ

একবার পিট সিগার শোনা শুরু করলাম। সে কী মধুসুধা তার কণ্ঠে! আমি তো অবাক। বাংলায় এমন মধুকণ্ঠ শুধুই কবীর সুমনের। এমনকি মাঝে মাঝে যে কথাগুলো বলে সুমন, তার ঢংও কিন্তু আমার মনে হয় পিট সিগারের মতো। মনে হয়, দুইটা একই মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন মহাদেশে ভিন্ন সময়ে বেঁচে ছিলেন বা আছেন। মেবি এটাই পরম্পরা শিল্পের। পাশাপাশি হাত ধরে চলা অবিরাম।

মনে পড়ে, টেক্সাসের লাবাকের মাহন লাইব্রেরি থেকে যেদিন 'পিট সিগার : ইন হিজ ঔন ওয়ার্ডস' নামের ঢাউস বইটা কিনছিলাম। বইটা প্যাক করে দেওয়ার সময়, বৃদ্ধা মিষ্টি করে হাসলেন। আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বললেন, হি ইজ দ্য স্টার অফ আউর টাইম। আমি বললাম, মা, উনি চিরকালের।

ও হ্যাঁ, কবীর সুমনের একটা চমৎকার ভিডিও-ইন্টারভিউ আছে অঞ্জনের নেওয়া। সেখানে সুমন জানাচ্ছেন, তার সাথে ফ্রান্সে পিট সিগারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আহা সুর এজন্যই অসাধারণ। এত বিশাল সুরের প্রাণ। সারা পৃথিবীকে বেঁধে ফেলতে পারে একসাথে। ভাষা এখানে সীমানাদেয়াল (ট্রাম্প-ওয়াল) বসাতে পারে না। যে কারণে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'জালালি কইতর' গানও শোনা যায় একই সাথে।

অভিবাসী মানুষ-জীবনের বেদনাবোধ, কাতরতা আর যন্ত্রণার অঙ্ক হেমাঙ্গের চেয়ে আর বেশি কোথাও আমি পাইনি। হেমাঙ্গ লেখেন,

হবিগঞ্জের জালালি কইতর, সুনামগঞ্জের কুড়া
সুরমা নদীর গাঙচিল আমি
শূন্যে দিলাম ওড়া।
শূন্যে দিলাম ওড়া রে ভাই যাইতে চান্দের চর

ডানা ভাইঙ্গা পড়লাম আমি
কইলকাতার ওপর...তোমরা আমায় চিনোনি।

শুধু দেশ ভাগ হলেই দেশভাগের ঘা তৈরি হয় না। বিচ্ছেদেও দেশভাগের অনুভূতি হতে পারে। অন্যদেশে মানুষের যে হিজরত, সেখানেও এই গান ভয়ানক প্রাসঙ্গিক। এই মুহূর্তে কালিকাপ্রসাদের কথা মনে পড়ে। আহা শাহ আবদুল করিমের গান কালিকার চেয়ে দরদ দিয়ে আর কেউ গায়নি।

ভাটি অঞ্চলের করিম বলতেন, তন্ত্রমন্ত্র করে দেখি তার ভিতরে তুমি নাই। কেন বলতেন? দূর সুনামগঞ্জের এই বড়োমানুষ। তিনি রহস্যের উত্তর জানতেন, তাই বলেছেন,'ভক্তের অধীন হোও চিরদিন থাকো ভক্তের অন্তরে'। কী অদ্ভুত! সবাই বলে, গুরুর অধীন হতে। মোক্ষ লাভের লক্ষ্যে। অথচ করিম কীনা বলে, ভক্তের অধীন হতে!

মানুষের জীবন মূলত ঝিলমিল ঝিলমিল করতে থাকা ময়ূরপঙ্খি নাও। মাথার উপর অতিকায় সূর্য টেনে টেনে হাওরবাওরের উপর দিয়ে শুধুই বয়ে যাওয়ার। মাঝে সাঝে কিছু স্টপেজ। তারপর একদিন অনন্ত যাত্রায়...

০২

বেশ কিছুদিন ধরে 'পেণোয়া'-র গান শুনছিলাম। কী যে ঝিম লেগে থাকার মতো পবিত্র মুহূর্ত! সুরের ঝক্কি নেই। বাদনের ঝঙ্কার নেই। কিন্তু গান আছে। হ্যাঁ, অসাধারণ তাদের পরিমিতিবোধ। বিশেষ করে, দুইটা গান, 'এ রুহের তলে' আর 'রাতের সাঁতার'।

ব্যান্ডটি মেবি চিটাগাঙের। আমি পেণোয়া নামের অর্থ জানি না। কিন্তু একটাকিছু হবে বুঝতে পারি যখন তারা গাইতে থাকে, 'এ রুহের তলে একফালি রাত্রি ঘুমায়'। মৃদু শান্ত বাতাস ও পবিত্র আঁধার ঘিরে রয়। আর তাদের আরও আরও গান শুনতে ইচ্ছে করে। কেননা, তারা বলেছে, 'এক চোখের স্বপ্ন আরেক চোখে দেখায়'...

অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা

রাজিয়া নাজমী

নিউ ইয়র্ক সিটি হল পার্ক যে-উদ্দেশেই তৈরি হোক না কেন, চারদিকের আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, ব্যস্ত রাস্তার মাঝে এই পার্ক নীরব থাকে না। কেনো না কোনো কার্যক্রম চলতেই থাকে। পার্কটি মেয়র অফিস সংলগ্ন বলেই এখানে বেশিরভাগ সময় প্রতিবাদমূলক জমায়েত হয়। তবে প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে হয়। সরকারের কাছে ন্যায্য দাবির পাশাপাশি আগামী ইলেকশনে সরকারি পদ পাবার ক্যাম্পেইনের জন্যও জমায়েত হয়। ভোট পাবার জন্য তারা তা-ই বলে যা আমরা শুনতে চাই।

পার্কে বসে আমি সবার তফাৎ দেখি। হতাশার ভিতরে অফিসে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ বসে থাকি। এক ব্লক দূরে ফেডারেল প্লাজা আদালতের ফাইলে চাপা পড়ে থাকা মানুষের জীবনের বাস্তব দৃশ্য চোখে ভাসে—সেই অসহায় অবস্থায় পদপ্রার্থীর মনভোলানো কথা শুনে মন যখন অন্যমনস্ক হয়ে যায় তখন যদি কানে আসে 'স্টেট অব ইজরায়েল মাস্ট গো' — অন্যমনস্ক মন সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করে এমন স্লোগান কানে এলে ধরেই নিতাম — কোনো ইসলামিক দলের বৃথা চেষ্টা — প্যালেস্টাইনিদের জন্য।

গতবছর সেদিনের এই জমায়েত ছিল একদল হেসিটিক ইহুদির। হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা 'জায়নবাদবিরোধী অর্থ সেমিটিজমবিরোধী নয়। মাইকে ওরা বলছে, প্যালেস্টাইনের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের চুপ থাকা উচিৎ নয়। যখন একজন ভুক্তভোগী তার জমি দখল মেনে নিতে অস্বীকার করে, এটা তাকে ইহুদিবিরোধী করে না।'

ওদের এই জমায়েত ছিল নির্যাতিত প্যালেস্টাইনের পক্ষে সক্রিয়তা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। অতীত ও বর্তমান ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে

সচেতনতা এবং ন্যায়বিচার আনার এই প্রচেষ্টা যে ইহুদিদের জন্য মোটেও হুমকি নয় তা প্রচার করা।

আমি ওদের দলের প্রধানকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন চাইছেন না ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকুক?

আমাকে পাশে বসিয়ে বলল, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ তাওরাত অনুসারে ইহুদি রাষ্ট্র থাকা যেমন হারাম, তেমনি অন্য লোকদের উপর জুলুম করা, দখল করা নিষিদ্ধ। তাওরাতের আদেশগুলি উপেক্ষা করে ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টি করার ফলে হাজার হাজার আরব ও ইহুদির জীবনে মর্মান্তিক ক্ষতি হয়েছে। পবিত্র ভূমিতে সংঘাতের আগুনের ইন্ধন ইসরায়েলি সরকারের চলমান অপরাধ। যারা সমস্ত ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ইসরায়েলের সমর্থক হিসাবে চিত্রিত করে এবং এমনভাবে দাবি করে যে, প্যালেস্টাইনপন্থী অ্যাক্টিভিস্টরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে, তারা ইহুদিবিরোধিতাকে উস্কে দিচ্ছে। এভাবে সমস্ত ইহুদিদের একটি সংঘাতে টেনে আনা অন্যায়। তারা ইহুদি ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, ধর্মের নামকে অপমান করছে। আমরা সিটি কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে দাবি করতে এসেছি, তারা যেন জায়নিজমের সাথে জুডাইজমের সংমিশ্রণ না করে। কারণ, তা হবে প্যালেস্টাইনপন্থীদের জন্য একটি অন্যায্য অপমান এবং ইহুদিদের জন্য মারাত্মক রকমের ক্ষতিকারক।

আমার অনুজপ্রতিম ফিলিস্তিনি বন্ধু বাসমা একদিন বলেছিল আমেরিকান লেখক জেমস বল্ডউইন ১৯৭৯ সালে তাঁর প্রবন্ধে একটি বাস্তবতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরে লিখেছিলেন—ইসরায়েল রাষ্ট্র ইহুদিদের পরিত্রাণের জন্য তৈরি করা হয়নি; এটি পশ্চিমা স্বার্থের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ফিলিস্তিনিরা ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি এবং ইউরোপের দূষিত খ্রিস্টান বিবেকের জন্য মূল্য পরিশোধ করে আসছে।

বাসমা অ্যামেরিকায় বসবাস করছে বহু বছরে ধরে। ইসরাইলি পাসপোর্ট নিয়ে প্রায় বছরেই পরিবারের কাছে বেড়াতে যায় জেরুজালেমের একটি শহরে যেখানে ওর পরিবার থাকে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে অ্যামেরিকা যখন শরৎকালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সেই সময় লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিদের মতো, বাসমা প্রতিদিন যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে পার করছে, বিশ্ব তার শিরোনাম দিয়েছে – an escalation of the Palestinian-Israeli conflict.

বাসমার পরিবার এখনও ভালো আছে। তবু ও রোজ ফোন করে মাকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আত্মীয়দের খোঁজ নেয়। খোঁজ নেয় গাজাতে শ্বশুরবাড়ির লোকদের। যাদেরকে বাসমা দেখলেও ওর স্বামী ইসমাইল কখনও দেখেনি।

বাসমা মায়ের কাছে শোনা খবর থেকে এখনও বেঁচে থাকার খবরটুকুই ওর আশি বছরের শ্বশুরকে জানিয়ে দেয়। বাকি কথা নিজের কাছেই রাখে। বাড়িঘর ছেড়ে ইসরাইল সরকারের হুকুম মতো যেখানে যেতে বলা হয়েছে সেখানেই চলে গেছে ওরা দল বেঁধে। তবে যেতে যেতে দলটা ছোট হয়েছে। খাবারের অভাবে,পানির অভাবে — পর্যাপ্ত গোলাগুলির কারণে অনেকেই শেষ পর্যন্ত জীবন বাঁচাতে পারে নাই। বাসমা এসব খবর শুনেও অস্থির হয়, না জানলেও অস্থির হয়। আধা ঘুমে সে দেখে বোমাবর্ষণে গুঁড়িয়ে দেওয়া একটি বাড়ির স্তূপের ভিতর থেকে একটি হাত বের হয়ে আছে। হাতের তালুতে একটুকরো রুটি — পাঁচ বছরের ছেলেটি সিমেন্ট বালুতে মাখামাখি মুখে মায়ের হাত থেকে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটু আগেই তো মা খাবার হাতে নিয়ে তাকে খাওয়াতে এসেছিল। বোঝে না সে মা কেন বের হয়ে আসছে না?

দুজন ইসরাইলি সেনা কাঁধে বন্দুক নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে — ছেলেটি ওদের কাছে দৌড়ে যায়। আরবিতে বলে, আমার মাকে বের করে আনো। আমাকে আরেকটা রুটি দিতে বলো। একজন সেনা কাঁধের বন্দুক নামিয়ে ছেলেটির দিকে তাক করতেই অন্য সেনা বন্দুক নামিয়ে দিয়ে বলে, ছেড়ে দাও। ও হয় না-খেয়ে মরবে, নয় আবার বোমাবর্ষণে। থাক দুই-একদিন বেঁচে।

এই দুঃস্বপ্ন দেখার পর থেকে বাসমা প্যালেস্টাইনে নিজের জনগণের সাথে সারারাত জেগে থাকে।

বাসমার শ্বশুর ইব্রাহিম, ১৯৬২ সালে তাঁর বাবামায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে মিশরে গিয়েছিল পড়াশোনা করতে। ফিরে আর যাওয়া হয়নি।

নিজের মাটি ছেড়ে চলে আসার দুইযুগ পরে অনুমতি নিয়ে সে একবারই যেতে পেরেছিল—প্যালেস্টাইনে—গাজাতে।

ইজিপ্টে আসার তিন বছর পরে, ১৯৬৭ সালে কলেজ থেকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে দেখে দরোজার সামনে রোদে পোড়া মুখ, ধুলোবালিতে মাখামাখি কাপড়ে তার কয়েকজন বন্ধু দেয়ালে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে। আলিঙ্গনের আবেগী

কষ্টে কেঁদে ফেলে বলে, হেরে গেলাম। ছয়দিনের সেই যুদ্ধে ইসরাইলের বিজয়, নিজেদের পরাজয় নিয়ে ওরা একটি কথাই বলেছে — আমরা যুদ্ধ করতে পারিনি। আমাদের অস্ত্র ছিল না। ওরা আমাদের তাড়া করেছে শুরুতেই। আমরা পালিয়ে এসেছি।

ইব্রাহিম গ্রাজুয়েশন করে। হাতে সার্টিফিকেট নিয়ে মায়ের হাত অনুভব করে। সে তার রুমে গিয়ে সার্টিফিকেট ঝোলাবার জন্য যে-দেয়াল সে খোঁজে, সেই দেয়াল সে দেখে না। আজ যে তার গাজার বাড়িতে উৎসব হবার কথা ছিল। তার মা সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে সবাইকে দেখাবার আনন্দে মেতে উঠত।

জীবন বাঁচাতে পায়ে হেঁটে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পালিয়েছে পাশের দেশে—বেশিরভাগ জর্ডানে। ইব্রাহিমের মা গুলিবিদ্ধ এক সন্তানকে বাবার পাশে কবর দিয়ে জীবিত দুই সন্তানকে নিয়ে রিফুজিদের মিছিলের সাথে হেঁটেহেঁটে চলে গেছে আম্মানে। ইব্রাহিমের সার্টিফিকেট বাড়ির দেয়ালে ঝোলাবার জন্য মা নেই। দেয়ালও নেই।

সেই যুদ্ধের পরে যারা বাইরে ছিল তারা নিজেদের ভূমিতে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছে নানাভাবে। এমনকি রেডক্রসের সাহায্যের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে। যদিও তাদের ভূমির অনেক অংশ তখন ‘অকুপাইড’ হয়ে গেছে। ইসরাইল সরকার শতশত বয়স্কদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেও সহস্র যুবকদের ফিরে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পৃথিবীতে তাদের জন্য একটি শব্দ তৈরি হয় — DISPLACED — স্থানচ্যুত। এই শব্দটির অর্থ আসলে মৃতের মতো বেঁচে থাকা। ৬৭ সাল থেকে বদলে যাওয়া পরিচয়ে ইব্রাহিমের নিজেকে অন্য কেউ মনে হতো। তাঁকে আশ্রিত দেশে থাকার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় ফর্ম পূরণ করতে। প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখতে হয়। শৈশবের কথা বলতে না পারার শ্বাসকষ্ট নিয়ে জন্ম কোথায় সেই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সে জানে তার আর ফিরে যাওয়া হবে না। একজন অতিথি হিসাবেই হয়তো কোনোদিন যেতে পারবে। নিজের দেশের নাগরিক হিসাবে নয়।

যুগ পার করে অনুমতি নিয়ে ইব্রাহিম প্যালেস্টাইনে গিয়েছে। সে দেখে মাটি তেমন করেই বুক পেতে শুয়ে আছে — উপুড় হয়নি। সেই বুকে কেটে অকুপাইড লেখা। তাকে ওরা মাটি দেখার অনুমতি দিয়েছে, স্থান পাবার জন্য নয়।

যে আলেনবাই সেতু পার হয়ে গিয়েছিল ইজিপ্টে, আজ দুইযুগ পরে ইসরাইল চেকপোস্টের ক্লিয়ারেন্সের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সেই সেতু পার হয়ে ওপারে যাওয়ার জন্য। যেখানে অপেক্ষায় আছে তার স্বজন। যেখানে কবরে শুয়ে আছে তার বাবা, দাদা — তার পূর্বপুরুষ।

তার মনে পড়ে ছেলেবেলার বন্ধুদের কথা। যেতে দেবে কী ওরা আরেকবার হেঁটে বেড়াতে তার জন্মস্থানে? মাটির ঘ্রাণ নিতে? কীভাবে সে মাটিতে পা রাখবে? একজন অতিথি? দর্শনার্থী? উদ্বাস্তু? নাগরিক!

সারাদিন পরে ইব্রাহিম অনুমতি পেলো। সেতুতে পা রেখে সে কাঁদে। তার চোখের জল সে ফেলতে চায় মাটির বুকে। লিখে দিতে চায় — আমি তোমারই একজন। নির্বাসিত আমি আমার মাতৃভূমিতে হাঁটছি। আমার মাতৃভূমি — ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা — প্যালেস্টাইন।

বাসমা ওর আশি বছরের শ্বশুরের পাশে বসে আলজাজিরা অন করলে, সে বলে, অ্যামেরিকার কোনো নিউজেই কী সত্য বলছে না? আজ কতদিন হলো? কী বলেছে ওরা, সত্যি ছয়দিনে ৬০০০ বোমা ফেলছে? ১০০০ শিশুকে মেরেছে? ৩ হাজারের বেশি নিহত হয়েছে, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে যারা তাদের বের করবে কারা?

ইসমাইল বাবার কাছে বসে বলে, আমাদের অধিকার পুনর্নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের অগুণতি রেজোলিউশন — প্রতিরোধ করা, দখলমুক্ত করা, আমাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়া — এসব কী এতটা কঠিন পড়া? পঁচাত্তর বছর হয়ে গেল!

ওদের কথার মাঝে আঠারো বছরের হাশিম ঘরে ঢুকে বলে, আজকের অনেক ছবি থেকে একটি দেখে আমাকে বলো, হামাস কী তৈরি ছিল ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করতে? কী হলো এখন? গেল তো গাজা? দেখো, একটা শিশুর সারা শরীর পড়ে আছে ইটের স্তূপের নিচে। শুধু ওর গলা থেকে মুখটা বাইরে। চিৎকার করে কাঁদছে।

টেলিভিশন বন্ধ করে বৃদ্ধ দাদার পাশে শুয়ে পড়ে হাশিম মাকে কাছে টেনে নেয়। পঁচাত্তর বছর ধরে নিজেদের ভূমির অধিকারের প্রশ্নে তিন জেনারেশনের ওরা পাশাপাশি শুয়ে ভাবছে — অন্য সব দেশের মতোই একটি জমিন — তাহলে কেন? এই জমিন এত বিশেষ হবার কারণ কী?

ইব্রাহিমের মনে পড়ে তার স্ত্রীর কথা। পারেনি সে যেতে নিজের জন্মস্থানে। ইব্রাহিমের মনে পড়ে শেষ দেখা গাজা।

নাতির মাথায় হাত রেখে সে বলে, গাজায় আমার শেষ রাত ছিল তোমার পূর্বপুরুষের ছোট একটি ঘরে। সেই রাতে আমি ঘুমাইনি। ঘুম আমার জন্য আসেনি। নিদ্রাহীন চোখে আমি ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। গভীর অন্ধকার ঘরের ছাদ কেড়ে নিয়েছিল। আমি জানালা দিয়ে ডুবে যাওয়া চাঁদের সামান্য যে আলো ছিল তাতে অগণিত প্রশ্নের মাঝে আমার জন্য একটি উত্তর খুঁজেছি।

আমার অতীতকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমার জন্য এতদিন যে-সেতু নিষিদ্ধ ছিল সেই সেতু পার হয়ে এই যে আমার মাটিতে ফিরে এসেছি, পথে পথে অকারণে স্পর্শ করেছি অনেককিছু, আবার অকারণে অবহেলা করেছি। কেন?

যেমন আমি সারাজীবন নিজের সাথে কথা বলি, অন্যরা ভাবে আমি নীরব হয়ে আছি। তেমনই কেউ দেখেনি আমি নিষিদ্ধ সেতু পার হতে হতে কতবার নিচু হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কতকিছু হাতে তুলে নিয়েছি। কেন তা বুঝবে না যেই সেনা আজ আমার থাকার মেয়াদ দেখে বলবে — যাও এবার।

রাত ভেঙে সূর্য ওঠে। আমি বিদায়ের জন্য তৈরি হই। সেতুর বুকের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি শেষবারের মতো পিছে তাকাই। না, ওরা আমাকে অত সময়ে দেয়নি। বরং দ্রুত পার হবার জন্য ইশারা দেয়। আমার কোনো অধিকার নেই এই এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার।

নির্বাসিত আমাকে ফিরে যেতে হবে। যেখানে অপেক্ষা করে আছে আমার স্ত্রী, ছেলে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে ওদের জন্য অনুমতি বের করতে। আমার ছেলেকে শেকড়ের সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখতে হবে। একদিন সে আনঅকুপাইড গাজাতে তাঁর ছেলেকে নিয়ে আসবে — মুক্ত প্যালেস্টাইনে।

আমার শেষরাতে জানলার বাইরের আলোআঁধারিতে যে-প্রশ্ন ছিল যার উত্তর আমাকে দিনের আলো দিতে পারে নাই। তোমাদের আমি সেই প্রশ্নই করব — যে প্রশ্ন আমার প্রিয় কবি মওরিদ বারগৌতি করে গেছেন।

> প্রাণের রেহেল থেকে ছোঁ মেরে
> কে তুলে নেয় রুহের অঙ্কুর?
> ওই জালিম ছাড়া আর কে —
> দখলদার বাহিনীর বন্দুকের গুলি ছাড়া আর কে?
> *মওরিদ বারগৌতির কবিতাংশ ভাষান্তর : বদরুজ্জামান আলমগীর।*

গল্প

পশু ও মানুষ

আহমদ মিনহাজ

কেউ আমায় 'পশু' বলে ডাকলে মনে খুশি হই ভেবে মানুষের সত্যিকার পরিচয়টি সে আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ভয়ে কেঁপে উঠি যখন কেউ 'মানুষ' নামে ডাক দিয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে এতদিন ধরে আছি তবু নিজেকে মানুষ ভাবতে খুব অস্বস্তি হয়। পশু হয়ে থাকাটা আমার জন্য মৌলিক ও সহজাত ছিল হয়ত; মানুষ হওয়ার নামে এই যে এত ভুলচুক, মাঝেমধ্যে হাঁপ ধরে বুকে, মনে-মনে ভাবি ভালোই ছিল সেই দিনগুলো যখন পশুকুলের একজন হয়ে মানুষ বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। অন্য পশুর মতো ওরা পরস্পরকে ভালোবাসত এবং সুরক্ষার প্রয়োজনে হিংস্র হত! মানুষে পালটে যাওয়ার দিন থেকে এই এক ঝামেলা হয়েছে, ভালোবাসতে গেলে হিংস্র হতে পারি না আর হিংস্র হলে ভালোবাসায় টিকে থাকতে পারি না। পশুকুলে ফেরত যাবার বাই চাপে মাথায়। নিজেকে জাগিয়ে তুলি পশুর মতো। তবু কোথায় যেন ভুলচুক ঘটে যায়। পশু হওয়ার ক্ষণে টের পাই আমি আসলে মানুষের মতো আচরণ করে ফেলছি। মানুষের মতো হত্যা করছি মানুষকে, শ্লীলতাহানী করছি মানুষীর, ধারাল শ্বদন্ত বসিয়ে খুবলে খাচ্ছি সমুদয় প্রাণীর রক্ত-মাংস-কলিজা। আমার কাণ্ড দেখে তোমরা ভয়ে ঘৃণায় ফেটে পড়ে, — 'দেখ কী নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়েছে জানোয়ারটা! সাপের মতো ছোবল মেরেছে, হায়েনার মতো খুবলে খেয়েছে, কুমির হয়ে গ্রাস করেছে! ও আসলে মানুষ নয়, পশুর মতো খিদে ওর; ওকে মানুষ ভাবতে ঘেন্না হয়, গা গুলিয়ে ওঠে।'

তোমাদের এইসব ধিক্কার শুনে আমার বুকের ভিতর হাহাকার জেগে ওঠে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, — না... না... ভুল ভাবছ তোমরা। আমাকে দিয়ে পশুর মতো হচ্ছে না। পশুরা যেভাবে করে সেভাবে হচ্ছে না। বাঘ-সিংহ-হায়েনার মতো হচ্ছে না। সাপের মতো হচ্ছে না। কুমিরের মতো মোটেও হচ্ছে না। পশু, পতঙ্গ অথবা সরীসৃপ যেমনটি করে আমায় দিয়ে সেটা হচ্ছে না। আমার নৃশংসতাগুলো অবিকল মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে।

আমি মানুষের মতো খুন করেছি। মানুষ যেভাবে করে ঠিক সেভাবে সারারাত ওকে বলাৎকার করেছি। যেখানে-সেখানে যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে মানুষের মতো মেরেছি। পশুরা যেভাবে পশু ও মানুষ মারে সেভাবে পারিনি। ওদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর টুঁটি চেপে ধরতে পারিনি। ওরা হচ্ছে জাত শিকারি; আমি ওদের মতো শিকারি হতে গিয়ে শেষমেষ মানুষের মতো করে শিকারি বনেছি। বিষধর কেউটে হয়ে ছোবল মারতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি, বরং মানুষ যেভাবে ছোবল মারে ঠিক সেভাবে মেরেছি। আমার কোথাও ভুল হয়েছে বুঝলে, সবকিছু গড়বড় হয়ে যাচ্ছে।

ধরো বাবা কেউটে মা কেউটে সাপের সঙ্গে দীর্ঘ রতিমিলন শেষে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। মিলনসুখে বিভোর মা কেউটে তারপর গর্তে ঢুকে অনেক ডিম পেড়েছিল। ডিম ফুটে ছানাপোনারা বেরিয়ে এসেছে। দারুণ মিষ্টি দেখতে হয়েছে বাচ্চাগুলো! পরস্পরের সঙ্গে লেপ্টে থাকার পর গর্ত থেকে মাথা তোলার মহড়া দিচ্ছে ওরা। ওদিকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির বাবা কেউটে শিকার না পেয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছে। মা কেউটে তখন সবে জলে নেমেছিল শরীর জুড়াবে বলে। বাবা কেউটে এই সুযোগে বাচ্চাগুলোকে সাবাড় করছে। মা কেউটের রাগ হওয়ার কথা ছিল; ও কিন্তু বাবা কেউটের ওপর রাগ করে থাকতে পারছে না। ক্ষুধার চোটে এরকম ভুল ওর নিজেরও মাঝেমধ্যে হয়, ছানাপোনা সাবাড় করে ফেলে মনের ভুলে। মা কেউটে বাবা কেউটেকে তাই ক্ষমা করে দিয়েছে সংক্ষিপ্ত তিরস্কারে, — 'ছিঃ! কী করলে এটা! বাচ্চাগুলো একা সাবাড় করে দিলে! মানুষের মতো হ্যাংলা হয়েছ, দিনরাত খালি খাই খাই। যখন-তখন যাকে-তাকে ছোবল মারছ মানুষের মতো। তোমাকে কেউটে ভাবতে ঘেন্না হচ্ছে আমার। ছিঃ!'

জগতে সর্পকুল প্রেম, খাদ্য ও রমণে সহজাত চিরকাল! আমার প্রেমের পিপাসা কেউটের মতো মোটেও হয়নি। খাদ্য ও পানীয়ের তেষ্টা কিংবা ধরো কাউকে রমণের লিপ্সা সহজ অভ্যাসের তাড়নায় পূরণ করার অধিকার আমি হারিয়েছি। আমাকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয় বিচিত্র পদ্ধতিমাফিক। কামবাসনা মিটাতে হয় অনেক ভেবেচিন্তে, বহুবিধ সামাজিক নিষেধের শর্তে দাসখত লিখে দিয়ে। জৈবস্বভাবের ছাড়পত্র আমার জন্য অবাধ নেই আর। জৈব অভ্যাসের দাসত্ব থেকে সামাজিক অভ্যাসে নিজের রূপান্তর আমাকে হিসাবী ও চতুর করেছে। মানুষ ও জগতের সমুদয় প্রাণকে ভক্ষণ, হত্যা ও বলাৎকারে আমি তাই পশুর সহোদর নই। পশুর মতো করলেও আমি সেই পশু নই যে ওটা করে সহজাত বাসনার ক্ষুধা মিটায়। মানুষ যেমন কারণে ও

অকারণে এইসব করে বেড়ায় ঠিক সেরকম আমি মানুষকে আঘাত করেছি, বিচিত্র প্রাণকে বিনষ্ট করার শক্তি ধারণ করেছি বক্ষে।

বিশ্বাস করো, পশু ও সরীসৃপের মতো করতে পারলে আমি বরং খুশিই হতাম, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সেটা হচ্ছে না। সহজ অভ্যাসের বশে আমি কিছু করতে পারছি না এখন। মায়ের পিচ্ছিল গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি শিখেছিলাম কেউটে সাপের বাচ্চা থেকে মানুষের বাচ্চা কেমন করে আলাদা হয়ে যায়। আমাকে শেখানো হয়েছিল কেউটে ফণা তোলে আত্মরক্ষার তাড়নায়, আর মানুষের বাচ্চা ফণা তোলে হৃদয়ের সুপ্ত বাসনার পিপাসা মিটায়। তোমাদের পৃথিবীতে এসে আমি শিখেছি পশুর কায়দায় কাউকে হত্যা করলে ওটা হত্যা হবে না, সকল প্রাণকে ধরে-ধরে পশুর কায়দায় বলাৎকার করলে ওটা বলাৎকার হয়ে যাবে না, ওটা খুব বেশি হলে পশুর জৈবস্বভাবকে স্মরণ করিয়ে দেবে, যাকে ক্ষমাঘেন্না করে মানুষ নিজেকে পশুর থেকে পৃথক করে নিয়েছিল। এই পার্থক্য তোমরা না দেখার ভান করছ ভাবলে হাহাকার জাগে মনে।

আশ্চর্য এই পৃথিবীতে আসার পর জেনেছি মানুষ হচ্ছে সেই প্রাণী যে তার নিজেকে অথবা অন্যকে কারণবশত এবং নিছক অকারণে বিনষ্ট করতে পারে। সগুণ এই ক্ষমতার মহিমায় নিজেকে সে অমৃতের বরপুত্র ঘোষণা করেছে। পশুরা আপন স্বভাবের দাস। মানুষ তার স্বভাবকে অতিক্রম করে অন্যকিছু হওয়ার জন্য নিজেকে খাটায়। ওর মধ্যে পশুর সহজাত ভাব রয়েছে, আবার পশুভাব দমন করার অপ্রতিরোধ্য শক্তিও ধারণ করে হৃদয়ে। মানুষ তাই পশুর সহোদর হলেও পশু নয়। তোমরা ভাবছ খুনগুলো করার সময় আমি অবিকল পশু হয়ে গিয়েছিলাম, ওই মানুষীকে বলাৎকার করার ক্ষণে পশুর মতো চড়াও হয়েছিলাম ওর ওপর... তোমরা ভুল ভাবছ। খুন ও বলাৎকারের মুহূর্তে নিজের মধ্যে কোনো রূপান্তর আমি টের পাইনি। খুনের আগে আমি মানুষ ছিলাম, খুনের পরেও তাই রয়েছি। ওই মানুষীর ওপর লালসা মিটানোর আগে যেরকম শান্ত ও ছটফটে ছিলাম, সবকিছু চুকেবুকে যাওয়ার পরে অবিকল সেরকম আছি। পশুভাব আমার মধ্যে জেগে উঠলে আমি কিন্তু ওভাবে পারতাম না, যেভাবে হত্যা করেছি মানুষকে, উদগ্র লালসায় রক্তাক্ত করেছি মানুষীকে। আমাকে পশু বলে তিরস্কার করার আগে একবার ভাবো জগতের সবচেয়ে হিংস্র পশুর পক্ষে ওভাবে করা সম্ভব কি না, আমি যেমনটি করেছি ওই মানুষকে, ওই পশুকে, আর ওই মানুষীকে!

তোমরা আমাকে ‘পশু বা জানোয়ার’ বলে যখন ডাকো কষ্ট হয় ভেবে এই তোমরাই ওদের থেকে নিজেকে পৃথক করে ‘মানুষ’ নাম নিয়েছ, জাঁক করে বলছ, — ‘ওদের জন্য যেটা স্বভাব, মানুষের জন্য সেটা হল কু-ভাব।’ তোমাদের কথা যদি সত্যি হয় তবে জেনে রাখো আমি অনেক চেষ্টা করেও ওই মানুষটিকে চিতার মতো ঘাড় মটকে মারতে পারিনি; সিংহের মতো রয়েসয়ে রাজকীয় বিক্রমে ওর রক্ত চাটতে পারিনি; হাজার চেষ্টা করেও ওই মানুষীকে ষাঁড়ের মতো আচমকা আঘাতে রমণের শিহরণে অপ্রস্তুত ও উতলা করতে পারিনি। আমি যেটা করেছি সেটা বলাৎকার, — মানুষ যেমনটা করে; যেভাবে আমি ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিলাম, যেন অনিচ্ছায় রাগমোচনের ক্ষণে সে চিৎকার দিতে না পারে। স্বেচ্ছায় রাগমোচনকে তোমরা ‘ভালোবাসা’ বলে ডাকো, অনিচ্ছায় হলে ওটাকে ‘বলাৎকার’ বলে চেঁচাও। আমি দুটোর বাইরে গিয়ে পশুকুলে ভিড়তে চেয়েছিলাম। রমণের ঋতু ওদের মনে ঘনীভুত হলে ওরা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমিও সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যাকুল ছিলাম। আফসোস! আমায় দিয়ে হয়নি! ঝাঁপ দেয়ার ক্ষণে আমাকে ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিতে হল, হাত পিছমোড়া করে বাঁধতে হল, আর ওকে বিদ্ধ করার ক্ষণে টের পেলাম ও কাঁদছে। পশুরা রমণের মুহূর্তে কাঁদে না। ওরা একে অন্যকে খেলায়, তারপর খেলা শেষ হলে আচমকা ওটা শুরু হয়, শেষ হয় যেন কিছুই ঘটেনি এতক্ষণ! ওই দেখ, সবুজ মাঠে দাঁত দিয়ে ঘাস ছিঁড়তে ওরা ব্যস্ত এখন!

পশুর এই সহজাত বন্যতাকে কী বলে ডাকবে এখন? এর নাম দেয়া যেতে পারত ‘অবিকার মিলন’। রাগমোচন শেষ হলে অবিকারচিত্তে বেঁচে থাকার ময়দানে ফিরে যাওয়া। আমি সেই ভাবের বশীভূত থাকতে চেয়েছিলাম আজীবন। পশু থেকে নিজেকে পৃথক ভাবার কারণে সেটা হল না। যা হয়েছিল সেটা হয়ত বলাৎকার; — মানুষ যেটা আচমকা করে ফেলে যেখানে-সেখানে যখন-তখন; অতঃপর অপরাধবোধ হানা দেয় মনে, আর নিজেকে সে অপরাধী করে পশু ভেবে। মানুষ ভুলে যায় পশুরা কখনও অপরাধ করে না। ওরা হত্যা ও রমণে উতলা হয় জৈব নিয়মের ফেরে। হরিণী ঋতুচক্রের ফেরে হরিণে উতলা হয় আর সুগন্ধে মাতাল হয় চম্পাচামেলির বন। ওরা দায়িত্বশীল নিজের সহজ স্বভাবের টানে। তোমরা যাকে ‘নিষেধ ও ব্যাভিচার’ বলো পশুরা দায়মুক্ত তার থেকে।

একবার ভাবো, মা পশু কতটা দায়িত্বশীল তার নিজের স্বভাবে! মা কুমির বাচ্চাদের আগলে রাখে ক্ষুধার্ত বাবা কুমির থেকে। বাঘিনী চণ্ডকালী হয়ে

বাচ্চাদের আগলায় ক্ষুধায় পাগল বাঘের থাবা থেকে। জগতের সমুদয় স্তন্যপায়ী মাতৃপ্রাণ আপসহীন আগলে রাখে শিশুপ্রাণ ঘর ও বাইরের শত্রুর থেকে। ওরা এভাবেই স্বাভাবিক নিজের জীবনে। তাকিয়ে দেখ, জলের সন্ধানে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে হাতির দল। জলকষ্টে বাচ্চা হাতিটি লুটিয়ে পড়েছে ঊষর প্রান্তরে। বয়স্ক হাতির দল ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখে বাঁধভাঙা অশ্রুর ঢল নেমেছে, শুঁড় দিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে দলের কনিষ্ঠ সদস্যটিকে। এই মমতা হচ্ছে 'দায়িত্বশীলতা'। পশু থেকে নিজেকে পৃথক করার দিন যখন এল তোমরা 'দায়িত্বশীলতা'র নাম দিলে 'মমতা ও ভালোবাসা'; 'সুরক্ষা' বলতে পশুরা যেমন বুঝে তোমরা তার নাম পালটে রাখলে 'মানবতা'! একবার ভাবো, পশুরা এইসব বিশেষণ ছাড়াই দায়িত্বশীল হয়। পশু হতে গিয়ে দেখেছি আমি ওদের মতো নাই আর। নিজের সুরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে অন্যকে অরক্ষিত করেছি বহুবার। পশুর সঙ্গে আমার তুলনা শোভন নয়। তোমাদের ভুল হচ্ছে কোথাও। তোমরা বরং বলতে পারতে আমি পশুর মতো হত্যা ও রমণ করতে শিখিনি, মানুষের মতো বিনষ্ট করছি মানুষ ও সমুদয় প্রাণ।

আমাকে পশু, সরীসৃপ অথবা জানোয়ারের নাম ধরে ডেকো না। ওদের অতুলনীয় মারণবিষ, নিজেকে সুরক্ষিত রাখার আয়ুধ আমার জানা নেই। আমাকে অস্ত্র বানিয়ে নিতে হয়েছিল। একদিন ওটা সত্যি প্রয়োজন হয়েছিল। গুহার বাইরে বুনো শ্বাপদের গরগর আওয়াজ পেয়েছিলাম। ও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বুঝে শুকনো কাঠে পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়েছি আর বল্লম হাতে পালটা হুংকার দিয়েছিলাম ওকে ভয় দেখাতে। বনের মধ্যে ভরদুপুরে গাছের ডালে ফণা তুলেছিল বিষধর সাপ। ওকে নিশানা করে তীর ছুঁড়ে মেরেছিলাম ছোবল মারার আগে। সাগরে আচমকা হাঙ্গরের লেজের ঝাপটা টের পেয়ে চকিত বেগে তুরপুন ছুঁড়ে রক্তাক্ত করেছি ওর শিরদাঁড়া। এসবের প্রয়োজন ছিল। বিষাক্ত বিছে পিষে মারাটা আমার জন্য প্রয়োজন ছিল। রক্তচোষা ঝোঁকের মুখে নুন ফেলে ওকে হত্যা করা দরকারি ছিল। সুরক্ষার জন্য পশুরা যেমন করে আমিও সেটা করেছি নিঃসঙ্কোচে। সেই প্রয়োজন এখন খেয়াল হয়ে গিয়েছে। আমি হচ্ছি খেয়ালি সম্রাট। হত্যা ও বলাৎকার করেছি খেয়ালি বাসনা মিটানোর নেশায়। আহা! আবার যদি পশুর জীবনে ফেরত যাওয়া যেত! আমি হয়ত দায়িত্বশীল হওয়ার চেষ্টা করতাম একবার; পশুরা যেমন দায়িত্বশীল হয় একে অন্যকে খাদ্যে পরিণত করা ও আগলে রাখার প্রকৃতির বিধানে!

আমার এখন সেই সিংহের কথা মনে পড়ছে, পছন্দের সিংহীকে পাওয়ার জন্য অন্য সিংহকে সে তার নিজের ডেরায় ঢুকতে দেয়নি। সিংহী ওটা দিয়ে মেপে নিয়েছিল প্রেমিকের শক্তি ও বুদ্ধির ধার। আমার মধ্যে কোনো এক ধূসর কালে এই গুণ সহজাত ছিল। মানুষ নাম ধারণের পর থেকে বুঝে গেছি আমি আর দায়িত্বশীল নই নিজের সহজ পরাক্রমে, আমি বরং পছন্দের মানুষ ও মানুষীকে বীরত্ব দিয়ে মোহিত করার ছলে খুন অথবা বলাৎকার করে ফেলতে পারি অনায়াস। সিংহ নিজের সিংহীকে কখনও খুন করে না, সে বরং খুন হয় লড়াইয়ে ক্ষুরধার অন্য সিংহের কাছে। এর নাম হচ্ছে পশুত্ব। যাকে ভালোবাস তাকে পাওয়ার জন্য বলি দিও নিজেকে, মোহিত করো ওকে নিজের পরাক্রম দেখিয়ে। আমিও পশুর পরাক্রম দেখিয়ে মোহিত করতে চেয়েছিলাম ওই মানুষীকে। পারিনি। কারণ আমার মধ্যে তখন মানুষ জেগে উঠেছিল! আহা মানুষ! সে জানে না পশুকুলের সঙ্গে পৃথক হওয়ার দিন থেকে দুটানার সঙ্গে তার বসবাস। সে আজও ঠিক করে উঠতে পারল না তার এইসব হত্যা ও বলাৎকার পশু নাকি মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে বারবার!

কী মনে হয় তোমাদের, প্রবৃত্তির টানে আমি ওই মানুষীকে সারারাত করেছি? পাশব স্বভাবের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কামের বাসনা মিটাতে? ওই দেখ, পুকুরের জলে স্ত্রী হাঁসকে দলবেঁধে ঝাপটে ধরেছে পুরুষ হাঁসের দল। রমণের পুনঃপুনঃ আঘাতে বুদুবদ উঠেছে জলে। ছটফটে স্ত্রী হাঁস পালাতে ব্যাকুল কিন্তু নাচার পলায়নে! ওটা দেখে একমাত্র মানুষ বলবে হাঁস ও হাঁসিনীর মিথুন চলছে জলে। হংসমিথুন! — আহা শুনতে মধুর লাগে! আনন্দভৈরব রাগে নিমগ্ন শ্যামা শাস্ত্রী যেন ইতিহাসের ধূসর নদীতে হংস হয়ে সাঁতার কাটছেন আর সেই রাগের স্বরধ্বনিতে রাগমোচন ঘটছে জগতের! পুকুরের জলে পুরুষ হাঁসের পাশব আঘাতে অস্থির স্ত্রী হাঁস ছটফট ডানা জাপটায় পাশব পুলকে। ওরা মানুষ নয় তাই ওদের এই পাশবতাকে বলাৎকার বলতে তোমাদের খুব আটকাচ্ছে। কাব্য করে তাই বলছ 'হংসমিথুন'। বলাৎকার সামলে স্ত্রী হাঁস এখন জলে ভাসছে। ওর ভেজা ডানায় পুরুষ হাঁসের পরাক্রম লেগে রয়েছে। ও সাঁতার কাটছে যেন জলে কিছু ঘটেনি, যেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা হংসকমল হয়ে অনন্তকাল ধরে জলে ভাসছেন আর টিএম কৃষ্ণা 'তত্ত্বাব জীবাত্মম' বলে হাঁক ছাড়ার ক্ষণে বেহালা ও মৃদঙ্গম রাগ কিরওয়ানির সুর তুলছে জলে-স্থলে ও আকাশে। হংসযূথের পরাক্রমী এই বলাৎকার পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে। পুকুরের জলে ঘটা এহেন রমণে পাপ নেই, পুণ্য নেই, বিকার নেই, বাতিক কিংবা স্বার্থের লেশ নেই, শুধু বীভৎসরসের আধিক্য রয়েছে। হংসের কাছে ওটা

পরাক্রম হলে হংসীর কাছে পাশবিক স্থৈর্য; ওরা এভাবে কী সহজ মিলন ও মৈথুনে!

কেলিমত্ত হংসযূথের মতো আমিও ঝাপটে ধরতে চেয়েছিলাম ওই মানুষীকে। ভুলে গিয়েছিলাম আমি ওদের কেউ নই, ওদের জন্য যা সহজাত আমার জন্য সেটা পাশবতা। কারণ মানুষ নিজেকে হংসযূথ থেকে পৃথক ভাবে। আমাকে শেখানো হয়েছিল ওদের জন্য যেটা মিলন তোমার জন্য সেটা বলাৎকার। আমি তখন বনবাদাড় থেকে অনেকটা পথ হেঁটে আচমকা পৌঁছে গিয়েছিলাম মেঠো পথে, সেখান থেকে শানবাঁধা পথ পেরিয়ে উঠে পড়েছিলাম পিচঢালা সড়কে। সড়কের পাশে ঝোঁপঝাড় ছিল। সেখানে এক মানুষ আরেক মানুষকে বলাৎকার সেরে প্যান্টের জিপার টেনে উঠে দাঁড়িয়েছিল। যে বলাৎকার হয়েছে তার নিম্নভূমিতে রক্তের স্রোত বইছিল। গালে-পিঠে গভীর জখম। সে কথা বলার অবস্থায় ছিল না। হাঁসের মতো যেন কিছুই হয়নি ভাব করে জলে সাঁতার কাটার শক্তিতে গরিয়ান ছিল না। সুতরাং তোমরা যখন বলো, ‘দেখো মেয়েটার কী অবস্থা করেছে শুয়োরের বাচ্চা, তখন ভুল হয় তোমাদের সম্বোধনে। স্ত্রী শুয়োর কিন্তু জানে কখন পুরুষ শুয়োর চড়াও হবে ওর যন্তরমন্তর নিয়ে। ওরা একে অন্যের থেকে পালিয়ে বেড়ায়, লুকোচুরি খেলে, পুরুষ শুয়োর অতঃপর স্ত্রী শুয়োরকে ঠিক খুঁজে বের করে, ঘোঁত ঘোঁত শব্দে আচমকা প্রবেশ করে ওর পিচ্ছিল সুড়ঙ্গে।

আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলার ক্ষণে তোমাদের হয়ত মনে রাখা প্রয়োজন, শুয়োর যেমন করে আমি সেভাবে ওই মানুষীর পিছু নিতে পারিনি। ওই মানুষী টের পায়নি আমি ওর পিছু নিয়েছি। ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চাইছি। খেলতে-খেলতে আচমকা উৎপীড়নের শিহরণে ওর মনে পুলক জাগাতে চাইছি। আমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার কোনো কারণ তার জানা ছিল না। আমি শুধু সুযোগের ফেরে ওকে ঝাপটে ধরে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিলাম, অতঃপর দীর্ঘ শাবলে অজস্র ঘাই তুলে জখম করেছি। ও এখন নিশ্চেতন শুয়ে আছে। স্ত্রী শুয়োরের সহ্যশক্তি নেই, বোকা মানুষী তাই নিশ্চুপ শুয়ে আছে পরপারে, যখন পুকুর থেকে পাশব মিলন শেষে হংসযূথ ডাঙায় উঠছে। ওই মানুষীর জন্য কোনো জল কিংবা ডাঙা আর অবশিষ্ট নেই। কারণ সে শুয়োর কিংবা হংসযূথের কেউ নয়। ওর সঙ্গে আমার পাশব মিলন সাপের মতো হয়নি, হংসের মতো করে ওটা ঘটেনি, শুয়োরের মতো করে হয়নি। মিলন শেষে আমরা দুজন নির্বিকার মুখ করে রেঁস্তোরায় ডিনার সারতে যাইনি। তোমরা বরং বলতে পারো এই বলাৎকারটা অবিকল মানুষের বাচ্চার মতো

ছিল। মানুষ যেমনটা করে আর কী, ঠিক সেভাবে হারামিটা ওকে সারারাত জখম করেছে! আনন্দভৈরবী রাগ অন্তিমে এসে খুশির আবির ছড়ায় অম্বরে, অবিকল সেভাবে ওই মানুষী বাধ্য হয়েছিল রাগমোচন ঘটাতে। হায় মানুষী! তুমি পশু নও তবু বাধ্য হয়েছিলে পাশব মিলনের ক্ষণে রাগমোচনের। আমি যেমন পশু না হয়েও নিজেকে বাধ্য করেছি রেতঃস্খলনে।

তোমরা পশুর থেকে পৃথক হয়েছ বলে এত ভুলচুক এত অবদমন। ঘৃণা ও ভালোবাসা, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, সম্মতি ও অসম্মতি, জৈব ও বায়বীয় প্রেমের এত ভ্যানতারা। কী লাভ হল বলো? আটকাতে কি পারলে সেই পাশবতা যার নাম দিয়েছ 'হত্যা'; যাকে প্রয়োজন মনে করে ডাকছ 'জীবনযুদ্ধ'; গালভরে যার নাম রেখেছ 'হংসমিথুন'; যার ব্যতিক্রম হলে ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলে উঠছ, — ইস 'বলাৎকার' করেছে পশুটা! তোমাদের ওইসব প্রলাপবাক্য থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। আকাশে তখন পাক খাচ্ছিল অযুথ হংসবলাকা। ওদের মতো উড়ার ক্ষমতা থাকলে আমি হয়ত ঠিক পৌঁছে যেতাম হংস সরোবর। সেখান থেকে হয়ত উড়াল দিতাম মহাশূন্যে। ওরা স্মরণ করিয়ে দিল আমার ডানা নেই। উড়োজাহাজে করে উড়াল দিতে পারি বটে, ঢুকে যেতে পারি মেঘের দেশে, তবু কখনও উড়তে পারব না ওদের মতো করে, ওরা যেভাবে নির্বিকার ডানা মেলে উড়ে হাজার মাইল! এই অক্ষমতা আমায় পাগল করে দিল আর আমি গুলি চালিয়ে মাটিতে ঝটপট ফেলে দিলাম হংস সরোবরের পথে নামতে থাকা বলাকার ঝাঁক। বলাকার রক্ত দিগন্তে ছলকে উঠলে কে যেন 'বলাৎকার' বলে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল। কেশরবাই ততক্ষণে তীব্র হয়েছেন পটমঞ্জরী রাগে। আমার তখন মনে পড়ল জীবনের এইসব রাগ-রাগিণীর মায়া ছেড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পথে আমি মানুষকে খুন করে এসেছি; পিচঢালা সড়ক ধরে মেঠোপথে নেমে যাওয়ার মুহূর্তে মানুষীকে ধরে আচমকা সারারাত করেছি; যেন কেউ আমাকে মানুষ বলে কখনও ডাক দিতে না পারে।

মানুষ শব্দে খুব অস্বস্তি হয় এখন। পশু শব্দেও অরুচি টের পাই, হৃদয় আর ছলকে ওঠে না সুখে। আমি তাই আবার ফিরে যাব বিজন গুহায়, যেখান থেকে একদিন মানুষ হওয়ার জন্য হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। এবার ঢুকব, যদি অন্যকিছু হয়ে ফিরতে পারি কোনোদিন!

টম সাহেবের বাড়ি

কুলদা রায়

বাড়িটা ছিল টম সাহেবের। লাল ইটের। দোতলা। নীচতলায় ডাকঘর। দোতলায় একটি বড়ো সড়ো ঝুল বারান্দা। সেখানে যে ফুল-লতা ছিল, তার নাম — ব্লিডিং হার্ট।

একটু দূরেই মধুমতি। এই নদীর পাড়ে স্টিমার থেকে একদিন টম সাহেব নেমেছিল। এর পর কেউ আর কোনোদিন স্টিমারের 'ভো' শোনেনি। সেদিন থেকে নদীটাও বুড়ো হয়ে গেল।

এই বাড়িটার ছাদে মাঝে মাঝে চাঁদ ঝুলে থাকত। সেদিন অন্য কোথাও জ্যোৎস্না উঠত না। কেবল এই বাড়িটা ঘিরে থাকতো আলো। আর শীতল হাওয়া।

যেদিন এই ঘটনা ঘটত, সেদিন আগে ভাগে ডাক-হরকরারা কাজে বেরিয়ে যেত। আবার আগে ভাগে কাজ শেষ করে চলে যেত। দুপুরের পর থেকে ছোট্ট শহরটা থমথমে হয়ে পড়ত। এইদিনে আমাদের ঠাকুমা সন্ধ্যার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দিত।

আমাদের প্রদ্যুম্ন একদিন নাই হয়ে গেল। তারপর বেশ কবার নতুন করে ফুল ফুটল আমাদের কৃষ্ণচূড়ার ডালে। কয়েকটা শিউলিগাছ ঢলো ঢলো হয়ে উঠল। কয়েকটা পাখি পালক বদলালো।

আমরা যখন প্রদ্যুম্নকে ভুলে যাব ভুলে যাব করছি — সেই সময়ই সে ফিরে এল। বন থেকে ফেরা অন্য এক প্রদ্যুম্ন। গায়ে সবুজ গন্ধ। এই নতুন প্রদ্যুম্নকে কোনো কোনো দিদি-বৌদি চুরি করে নাড়ু মুড়ি খাওয়াত। একদিন লীলা মাসি ওর মাথায় চুড়ো বেঁধে দিল। ময়ুরের পালক গুজে দিলো কে জানি। এক বোষ্টুমী খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরল —

কালা — তোর তরে
কদমতলে চেয়ে থাকি।

সেদিন নদী থেকে একটি নতুন হাওয়া উঠল। এক রকম হাওয়া এর আগে কখনো দেখিনি। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরটি ঘুমিয়ে পড়ল। যে শিয়ালগুলি প্রহর ঘোষণা করত — সেদিন তারাও কেন জানি চুপ করে গেল। গাছের পাতারাও শব্দহীন।

টম সাহেবের বাড়িটার পাশে একটি তালপুকুর। কোনোদিন তার জল শুকায়নি। তার পাড়ে একটি বিবাহিত অশ্বত্থ গাছ। ঝুরি নেমে এসেছে মাটিতে। আঁকড়ে ধরে আছে নম্র একটি বটগাছকে।

সে-রাত ছিল ঘন অন্ধকার। হঠাৎ করে বাঁশি বেজে উঠল। কী যাদুময় সে-সুর। অন্ধকারের ভিতর থেকে অন্যরকম আলো বের হতে লাগল। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে একটি চাঁদ বাড়িটার কার্নিশে ঝুলে পড়ল। দোতলার একটি জানালা খুলে গেল। সেখানে দেখা গেল একটি মুখ। ফ্যাকাসে — থরথরো। মুখটি ফিস ফিস করে ডাকল, বাবা। বাবা। চিঠিটা কি এসেছে?

কার চিঠি? কোন চিঠি? আমি অমলের দিকে তাকালাম। অমল আমার দিকে। প্রদ্যুম্ন বাঁশিতে বিভোর। এ প্রদ্যুম্নকে আমরা কখনো দেখিনি। কখনো চিনিনি। জানিনি। কোনো-এক রূপের জগতে তার বাড়ি। সে রূপের জগতের সুর বাজিয়ে চলেছে। এই বাঁশির সুরে টম সাহেবের বাড়ির উপরে ধীরে ধীরে একখণ্ড মেঘ জমল। ঝিরঝির করে বৃষ্টিও ঝরল। শান্ত হাওয়া বইল। কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে ভরে গেল চারিদিক।

এই সময় টম সাহবের ঝুলবারান্দার দরোজাটা খুলে গেল। একটি মেয়ে ঘোরলাগা চোখে বারান্দা থেকে হেঁটে হেঁটে নিচে নেমে এল। হাওয়ার মধ্যে পা ফেলে ফেলে মেয়েটি তালপুকুরটির পাড়ে এল। ঘাঘরাটা সামান্য একট উঁচু করে ধরল। তারপর পুকুরের জলের উপর তারা কোমল শাদা পা রাখল। অমল আমার হাত খামচে ধরল। চেঁচিয়ে বলল, চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ কর।

চোখ বন্ধ করব কি? আমাদের চোখ কি তখন আমাদের চোখের মধ্যে ছিল? চোখগুলো সব বাইরে বেরিয়ে পড়েছে নিজের ইচ্ছেয়। মেয়েটির পিছে পিছে ঘুরছে। ফিরছে। তার গা থেকে ঝরে-পড়া আলো প্রাণের মধ্যে টুক টুক করে কুড়োচ্ছে। এই চোখহীন অন্ধ চোখ-কুঠুরী থেকেই আমরা দেখতে পেলাম, তালপুকুরের মাঝখান অবধি ছোট ছোট পায়ের ছাপ চলে গেছে। জলের

মাঝখানে ফুটে আছে একটি অনন্ত ফুল। শত শত তারা সে-ফুলটিকে পাহারা দিচ্ছে। তার পাপড়ি সত্যি সত্যি অনেকগুলো নীল চিঠি।

এই চিঠিগুলো কে লিখেছে? অমল? প্রদ্যুম্ন? না — আমি? কখনো কি লিখতে পেরেছি এ-রকম কোনো চিঠি!

চৌখুপির আনন্দ

পলি শাহীনা

বেশ কিছুদিন আগে অনামিকা একটা বেলি ফুলের গাছ এনে বারান্দার টবে লাগিয়েছে। বিক্রেতা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল — কয়েকদিনের মধ্যেই ফুল ফুটবে। বিক্রেতার কথা শুনে অনামিকা তো মহাখুশি। পরিচর্যার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু ফুল ফোটেনি। অনামিকাও অনেকটা আশা ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলার আলো-আঁধারিতে অনামিকা দেখে, গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁক হতে ধবধবে সাদা বেলি ফুল ওকে উঁকি দিয়ে ডাকছে। ফুল ফুটেছে! ফুল ফুটেছে! অনামিকার ভারি আনন্দ হলো! ঘরে সন্ধ্যার আলো না জ্বালিয়ে ও অন্ধকারে চোখ বুজে মিশে থাকে ফুলের শরীরে, গাছের সঙ্গে। ও ধীরে ধীরে ডুবে যেতে থাকে বেলি ফুলের গন্ধে।

অন্ধকারের শরীরজুড়ে আচমকা অনামিকা একটা ফিসফিস ডাক শুনতে পায়। কে যেন কাঁপা কাঁপা গলায় নাম ধরে ডাকছে। ভালোভাবে কান পাততেই হুড়মুড়িয়ে ধেয়ে আসে ছোটবেলা।

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' — আনোয়ারচাচার সুরেলা কণ্ঠের গান স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে অনামিকা। ওর প্রিয় ঝোলা ভর্তি বেলি ফুল নিয়ে চাচা ডাকছে। সন্ধ্যায় ফোটা বেলি ফুল পরেরদিন দুপুরে ঝরে যাওয়ার আগেই কাকডাকা ভোরে চাচা ফুল নিয়ে আসতেন অনামিকার জন্য। উঠোনে দাঁড়িয়ে আদুরে গলায় নাম ধরে ডাকতেন। ঘরে তখনো সবার ঘুম ভাঙেনি। চোখ কচলাতে কচলাতে ঘর ছেড়ে উঠোনে নামতেই চাচার ঝোলা ভর্তি বেলি ফুলের ঘ্রাণে অনামিকার ঘুম উড়ে যেত দূর দিগন্তে।

চাচার হাত থেকে বেলিফুল নিয়ে দু'জনে হেসে হেসে গল্প করতো। চাচা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো। বেলি ফুলের গন্ধ ততক্ষণে উঠোন পেরিয়ে পুরো বাড়ি জুড়ে ম ম করছে। চাচার কাঁধের ঝোলায় মা কিছু চাল-ডিম-আলু দিয়ে দেন। কখনো নারিকেল-সুপারিও দেন। মায়ের হাতের কাছে যখন যা

থাকতো, তা দিতো। চাচাও যখন যা পেতেন তাতেই খুশি হতেন। চৌদিক আলো করে হাসতেন। চাচার হাসিতে অনামিকার গোটা দিনটি বেলি ফুলের মতো মিষ্টি হয়ে উঠতো। হাসতে হাসতে অনামিকার হাতে রঙিন কাঠির লজেন্স দিয়ে চাচা বিদায় নিতেন। অনামিকা তাঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে অপলক চেয়ে থাকতো।

আনোয়ারচাচা কোনোদিন 'ভিক্ষা চাই' বলে কারো উঠোনে চিৎকার করতেন না। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুলের বিনিময়ে যে যা দিতেন তা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতেন।

অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেলি ফুলের ঘ্রাণ তীব্র হয়ে ওঠে। মনের আকাশ ভেঙে অনামিকার চৌখুপি জুড়ে নেমে আসে স্মৃতিঝড়। ঝড়ের বেগে ঘোর কেটে ওর কেমন এলোমেলো লাগছে।

অনামিকা গ্রাম ছেড়ে ইট-কাঠের দেয়াল আর দেয়ালের ঠাসাঠাসি ভিড়ের চৌখুপির জীবন বেছে নিলেও গ্রাম ঠিকই রঙ-রূপ-গন্ধে ওকে প্রিয়জনের মতো আগলে রেখেছে। গ্রামের সহজ জীবন, অনিন্দ্য সুন্দর সব অনুভূতি ওকে সুখ দেয় এ চৌখুপিতে। ওর অনুভূতির উঠোনজুড়ে গ্রামের মমতাময় দৃশ্যগুলো ফুল হয়ে ফোটে, সুবাস বিলায়। জীবনের কাটাকুটি খেলায় অনেক বছর আগে গ্রাম ছাড়লেও, ফেলে আসা গ্রামখানি চায়ে ভেজা বিস্কুটের মতো ওর বুকের গহীনে লেপ্টে আছে। এত এত বছর পরও এ চৌখুপিতে অনামিকার গ্রাম কোজাগরী পূর্ণিমার আলো হয়ে কলকল করছে।

মাথার উপরের ছাদটিকে প্যারাসুটের মতো উড়িয়ে দিয়ে অনামিকার কল্পনাবিলাসী মন ওর গ্রামটিকে পরম আদরে ছুঁয়ে দেয়। গ্রাম ওকে শীতল ছায়া বাড়িয়ে দেয়, কড়ে আঙুল বাড়িয়ে কাছে ডাকে। অনামিকা আর ওর গ্রাম, পরস্পর পরস্পরকে ছুঁয়ে অনন্ত ভালোবাসায় ডুব দেয়।

তপ্ত দুপুর গড়িয়ে নকশাআঁকা নরম বিকেল নামে। বিকেলের ভাঁজে ভাঁজে চালতা ফুলের সুবাস ওকে ব্যাকুল করে তোলে। অনামিকাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে বাঁশঝাড় পেরিয়ে ঘন অরণ্য, তার মাঝখানে চালতা গাছ। কিন্তু ওই অরণ্যে যেতে মানা। চালতা গাছে নাকি ভূতপ্রেত থাকে। কে শোনে কার মানা! মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনামিকা ঠিক চলে যায় চালতা ফুলের কাছে। দীর্ঘ সবুজ পাতার আচ্ছাদন সরিয়ে বেলি ফুলের মতো সাদা নরম পাপড়ির চালতা ফুল নিয়েই তবে ও বাড়ি ফেরে।

'চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরে

জলে নরম গন্ধের ঢেউয়ে?' — জীবনানন্দ দাশ

আহা! সে কোন ছেলেবেলায় ডুবে অনামিকা আজ আনন্দে ভেসে চলছে!

আষাঢ়ের কালো আকাশের মতো চৌখুপির মন-কেমন-করা বন্দি জীবনের থৈ থৈ অন্ধকার মুছে দেয় হোগলা বন। মাথার উপর পাখির দল বৃত্তাকারে উড়ছে আপনমনে। পদ্মপাতায় টলমল করছে পানি। কলা গাছের ভেলায় চেপে হোগলা বন, পাগলা হাওয়ায় চুল উড়িয়ে, কচুরিপানা ডিঙিয়ে অনামিকা দূরন্ত উচ্ছ্বাসে এগিয়ে চলছে পদ্মফুলের দিকে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! যে-আনন্দ সমস্ত বিষন্নতা মুছে চৌদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অলৌকিক এক ভালোলাগার শিহরণে অনামিকা থরথর কাঁপছে।

চৌখুপির গর্ভে প্রাণ যখন আকুলিবিকুলি করছে, তখনই সবুজ মাঠ পেরিয়ে বুড়ো বটগাছটি অনামিকার কাছে চলে আসে। গাছটির নাম দিয়েছিল ও ঘুমগাছ। এ-গাছের নিচে কাঁধের গামছা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছে কত চেনা অচেনা মুখ। একদিন আনোয়ারচাচাকে দূর থেকে ও দেখেছিল অচেনা এক মানুষের সাথে কথা কাটাকাটি করতে। অতঃপর, ঠিক ঘুমগাছটির নিচে এসে দু'জনে হাত ধরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এ-গাছটির নিচে বসলে অনামিকারও ঘুমে দু-চোখ জড়িয়ে আসতো। ওর অনেক খেলার সাথি ছিল। ওরা একসঙ্গে মাটি-কাদায় পা ডুবিয়ে খেলতো। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে সোঁদামাটির গন্ধ শরীরে মেখে ওরা বুড়ো বটগাছটির নিচে ঘুমিয়ে পড়তো।

কী আশ্চর্য! বৃষ্টিভেজা মাটির গন্ধ, বটগাছটির ঝিরঝিরে হাওয়া, এ-চৌখুপিতে এসে অনামিকার চোখের পাতায় দোল খাচ্ছে। ও দুলছে, নাচছে আনন্দ উল্লাসে।

দুধের মতো সাদা আকাশ ভেঙে অন্ধকারের পাহাড় ঠেলে ওর বন্ধুদের মধুর কণ্ঠ ভেসে আসছে কানে। জগতের সমস্ত সুন্দর এসে ভিড় করছে যেন এ-চৌখুপিতে। ওর বন্ধুরা নাম ধরে ডাকছে আর বলছে, চলো বেরিয়ে পড়ি অজানার পানে। ওরা গলা ছেড়ে গাইছে — জীবনের গান। গানের শরীরজুড়ে কত কত আদর, ভালোবাসা।

আকাশচুম্বী দালানকোঠার ভিড়ে অনামিকার চৌখুপিটি কানায় কানায় ভরে ওঠে সুখ সুখ গন্ধে। বেলিফুলের তীব্র ঘ্রাণ আর ছোটবেলার আস্কারায় ওর হাতদুটো যেন ডানা হয়ে উঠেছে। সুখের বন্যায় ও ডানা মেলে উড়তে থাকে মুক্ত আকাশে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে লাল-সবুজ ঘুড়ি। ও উড়তে

উড়তে চলে যায় আনোয়ারচাচা, আম্মা, অরণ্য পেরিয়ে চালতাফুল, হোগলাবন, পদ্মফুলের কাছে।

ফুলেল সবাস, মুগ্ধতা ঘেরা সব দৃশ্য আর খাঁটি মায়ায় জড়ানো মানুষের ছায়ায় ঘেরা ছিল অনামিকার ছোটবেলা। মা-আনোয়ারচাচা আজ মনের দেয়ালে ছবি হয়ে আছে। ব্যস্ততার কাদাজলে নিমজ্জিত অনামিকার বহুদিন মায়াবী ছবিগুলোর সামনে দাঁড়ানো হয়নি। ছবির সামনে দাঁড়াতেই নিজেকে খুঁজে পায়, চোখ ভিজে আসে। মনখারাপের অন্ধকার সরিয়ে অনামিকার মনে হয়, ও যেন রুপোলি মায়ার চাদর জড়িয়ে চাচার গল্প শুনছে। মা ঠিক ওর পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এই তো বেশ সুখ সুখ লাগছে। আনন্দ লাগছে। ছোটবেলায় যেমন করে সুঁইসুতো দিয়ে বেলি ফুলের মালা গাঁথতো তেমন করে ও আজ মা-চাচা-ফুল দিয়ে ভালোবাসার মালা গাঁথছে মনের ক্যানভাসে। কী যে ফূর্তি লাগছে! বাতাসের চেয়েও বেশি বেগে ওর মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে। অনাদি-অনন্ত ভেঙে এবার অনামিকার দু-চোখ ভেঙে ঘুম নামছে।

কবুতরের বাসার মতো বিষণ্নতায় ঘেরা চোখুপির জীবন আনন্দে ভরে উঠেছে। আহা! ভালোবাসা! স্মৃতিঝড়ে বিধ্বস্ত অনামিকা হড়বড় করে চৌখুপির সব-কটা জানালা খুলে দেয়। বাতাসের শরীর বেয়ে ঘরের মেঝেতে আনন্দ লুটোপুটি খায়। জানালার চওড়া কার্নিশজুড়ে সাজিয়ে রাখা মানিপ্ল্যান্ট সহ বিভিন্ন ফুলের টবগুলো বাতাসে কাঁপছে। কী অনাবিল সুন্দর! আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে দোল খেতে খেতে অনামিকা ওদের আলতো করে ছুঁয়ে দেয়।

অনামিকা চৌখুপি থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেয়ে দুলছে আর বেলি ফুলের সুবাস শুঁকছে। কতদিন বদ্ধ এ-চৌখুপিতে নিজেকে ছুঁয়ে দেখবার অবসর মেলেনি অনামিকার। বহুদিন পর নিজেকে ছুঁয়ে দেখার আনন্দপ্লাবনে ও ভাসছে। হিম হিম ঠাণ্ডায় বেলি ছুঁয়ে থাকে অনামিকাকে, আর অনামিকা ছুঁয়ে থাকে প্রিয় বেলিকে। কী নিশ্চিন্ত ওরা পরস্পরকে ছুঁয়ে!

ঠিক তখনই কোনো-এক নাম-না-জানা রাতজাগা পাখি ডেকে ওঠে।

আমাদের দীর্ঘশ্বাসগুলো

বদরুন নাহার

আমার যখন বুদ্ধি হলো তখন দেখি, আমাদের মা বিধবা! আমরা বলতে মূলত আমি, ছোটপা আর সেজপা। কিন্তু আমাদের আরও বোন ছিল। বড়পা আর মেঝপা — , ভায়ের কথা পরে বলছি। বড়পা আর মেঝপার আমার জন্মের আগেই বিয়ে হয়ে গেলে, আমার কেমন ওদেরকে আমরা মনে হয় না। আর ভাই তো ম্যালা বড়, আলাদা উঠোন। যেন এক প্রতিবেশী। ঘর-সংসার কত কী তার! মফস্বলে আমাদের পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা বাড়ি। সেমিপাকা ঘরের ভেতর থেকে বড় হতে হতে প্রথম আবিষ্কার করলাম বৃষ্টির শব্দ সবসময় একরকম হয় না। এই যদি আষাঢ়ের ইলশেগুঁড়ির একটানা চিঁচিঁ শব্দে একসময় কান ধরে আসে। আর যদি বৈশাখের হঠাৎ বৃষ্টি নামে তো বড় বড় ফোঁটা, তবলার বোল তোলার মতো একটু একটু করে বেড়ে এইটি লয় তৈরি করে। আমাদের আমগুলোকে ফাটিয়ে যে শিলাবৃষ্টি হয়, তা তো একেবারে কাজী নজরুল। যেন সৃষ্টিসুখের উল্লাস। আমি অবশ্য জানি এইসব আমার আবিষ্কার-টাবিস্কার কিছুই না। ছোটপা ভালো বলতে পারতো। ওর মতে, আমি একটা গল্পিস। খালি গালগপ্প বানাই।

কথা একেবারে মিথ্যে নয়। ওই আমাদের সেজপা, কেমন মিস হ্যাঁর মতো! সবকিছু পরে পরে বোঝে, তাই ছোটপা দুঃখ পেয়ে আমার বদনাম করে। কারণ প্রায় রাতেই সেজপা স্বপ্ন দেখত! সকালে সেই স্বপ্নের শ্রোতা তো আমি আর ও-ই। ছোটপা স্বপ্ন দেখতো না। ও কেবল সেজপার স্বপ্নটাকে সাথে সাথে বিশ্লেষণ করে বলে দিত কেন এই স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু আমি, সেজপার স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে মনেমনে একটা স্বপ্ন বানিয়ে ফেলতাম! কেন জানি ছেলেবেলা থেকেই আমি ভাবতে পারতাম, অনেক দূর পর্যন্ত! তাই ওরা পাত্তা দিত না। পুঁচকি, যা নকলবাগিশ কোথাকার! সেজপা মেট্রিক দিবে, ছোটপা সবে নাইনে। কিন্তু ও বুদ্ধিতে পাকা বলে আমাকে মানতে চাইতো না। সেজপা মানত, সেজপা অবাক হয়ে বলতো, দ্যাখ, তুশিটার কত বুদ্ধি!

আমাদের টরটরে বুড়িটা। ক্লাস থ্রিতে পড়লে কি কেউ বুড়ি হয়? কিন্তু সেজপার কথায় রাগতে পারতাম না। এত আদর মেখে মিষ্টি করে বুড়ি বলে ডাকতো! অথচ এখন আমার আর কথা বলতে ভালোলাগে না। কেবল একা একা ভাবি, আমাদের সেই বেড়াডাঙ্গার বাসার কথা। উঠোনের জলপাই গাছ। বোনদের সঙ্গে বেড়েওঠা।

হঠাৎ করেই বৃদ্ধ লোকটি বলে ওঠে, বাংলাদেশ?

আমি কোনো উত্তর দেই না। যেন শুনতেই পাইনি, পাশ কেটে বেরিয়ে যাই। তাতে লোকটার বেশি ভাবান্তর হয় না। সে লেকের পাড় ঘেঁষে সামনে এগিয়ে যায়, নতুন কোনো তামাটে জাতির খোঁজে। গত ছয়মাসে এই লোকটিকে না-হলেও দশ থেকে পনেরো বার দেখেছি এই আমেরিকার প্রবাস জীবনে। হিলসাইডের সব প্রবাসী বাঙালিই তাঁকে চেনে। লোকটির নাম দিয়েছে বাংলাদেশবুড়ো। কাউকে পেলেই একটাই প্রশ্ন, বাংলাদেশ? তারপরই কাঙ্ক্ষিত দেশি মানুষের বাংলা কথা শুনে শুরু হয়ে যাবে লালের মোড়ের চা দোকানের মতো আড্ডা। যেন সোজনবাদিয়ার ঘাট!

এই কর্নেল টিলি পার্কে বয়স্ক বাঙালিদের হাঁটাচলা, বসে থাকা কিংবা বাচ্চাকে পার্কে ছেড়ে পাহারা দেওয়ার বাহানায় দেশের স্কুলের পাশে মহিলা মহফিল! গালগপ্পের এক চারণভূমি। প্রথম প্রথম এখানটাতে আমারও ভালো লাগতো, ঘরের পাশে এমন পার্কের গাছগুলো, ছোট লেকের হাঁসগুলো, ফাঁকা বেঞ্চিতে একা বসে থাকার মায়ায় ছুটে আসতাম। আমার বেজমেন্টের আবাসের মধ্যে থেকে দমবন্ধ হয়ে এলে আমিও ছুটে আসতাম এই পার্কে। তবে কথা বলতে নয়, আমার ওই কবরখানা থেকে মুক্ত বাতাস নিতে। ঘর থেকে তো মাত্র পঞ্চাশ কদম দূরত্বে পার্ক। সিঙ্গেল হাউজের বেজমেন্টের সাবলেট বাসিন্দা আমি। যেন নিজেই আমার কবর খুঁড়তে চাই, তাই শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কের এই কবরে চলে এসেছি। তাই কেউ হাভাতের মতো বাংলাদেশ...বাংলাদেশ বলে চিহ্নিত করে, খায়েস মিটিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলতে চাইলে, আমি সহ্য করতে পারি না। প্রায় আশির কাছাকাছি বয়সের লোকটির মুখভর্তি চাপ দাড়ি, স্নিগ্ধ এক উজ্জ্বল চেহারা। আমার স্মৃতিতে থাকা বাবার ছবিটির সঙ্গে খুব মিল! তবুও আমি আনমনে হবার ভাব ধরি, তার ভাঙা ইংরেজি প্রশ্নের উত্তর দিতে গদগদ হয়ে উঠি না। আমি চুপ থাকলে, সে আমাকে ঘাঁটায় না। এগিয়ে যায়। এদেশে অন্তত সবার এই পরিমিতি বোধ তৈরি হয়ে যায়। আমার বেঁটে উচ্চতা, উজ্জ্বল তামাটে গায়ের রঙ আর ছোট ববকাট চুলে অনেকের মনে একটু দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। আমি সেটাকে ভাঙাতে যাই

না। কেমন মনেমনে অনবরত বাংলায় ভেবে যাই। আমার বলতে ইচ্ছে করে না।

কেননা আগেই আমার বলার ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। সব ইচ্ছেটিচ্ছে মরে যাচ্ছে যেন! এই লেখা, এই আমার মতবাদটাকে আমার স্বাধীন মতামতটাকেই কেউ মেনে নিতে পারল না। কেন এমন লিখছি? আমার সব হুমকিপ্রাপ্ত দিন। আমার লেখক বন্ধুকে মেরে ফেলায় প্রতিবাদী হলে, যারা আমাকে গৃহবন্দি করল। আমি কি কোনোদিন কারো ইচ্ছেয় লিখব? লিখব না। এ কী আমার অভিমান? নাকি ক্ষোভ? আমার বন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ভাষাকে নির্দ্বিধায় খুন করেছিল যারা, আমার প্রতিবাদের ভাষাকে আইনের যত ধারার খপ্পরে ফেলে বাকবন্দি করেছে যারা, তাদের প্রতি ক্ষোভ, নাকি নিজের অসহায়ত্ব? নাকি দুঃখ? বেদনা, আপোসকামী হবার অক্ষমতা? আমার প্রতিজ্ঞার স্মৃতিরা কেঁদে ফেরে নিউইয়র্কের ফুটপাতে। আমি মেট্রোরেলে চেপে চলে যাই বর্ণবাদিতায় খ্যাত, অস্তিত্বের প্রতিহিংসার পরশপাথর হারলেমে। এটা নাকি কৃষ্ণাঙ্গদের রাজধানী! আমার কি? আমি এগিয়ে যাই মাউন্ট মরিস পার্ক পেরিয়ে ওয়ান টোয়েন্টি ফিফথ স্ট্রিট, তারও এক কোনায় গোলাপের পাপড়ির মতো হেসে থাকা অক্ষর, ডানকিন ডোনান্ট! আমার কর্মক্ষেত্র।

বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সাবেক কর্মী, আজ খুব সকালে গ্যাপের সাদা শার্টের উপর চকলেট রঙের অ্যাপ্রোন চাপিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি ডানকিন ডোনান্টের কাউন্টারের পেছনে, সুউচ্চ স্টিলের র‍্যাকের সামনে। গ্লাভস পরা হাতে থরে থরে সাজিয়ে রাখি ডোনান্ট, মানকিন, হ্যাশব্রাউন, হ্যামবার্গার। বরফকুচি দিয়ে তৈরি করি কফি লাতে, হোয়াইট চকোলেট স্মুথি কিংবা চলে যাই বাসকিন রবিন্সের ডিপ ফ্রিজের কাছে। ঘষেমেজে সাফ করি কাউন্টারে পড়ে থাকা আইসক্রিমের আঠালো রস। ক্যাশকাউন্টারের ডেস্কটপে হাত রাখার অধিকার এখনও হয়নি। আমার রাইটিং কিবোর্ডটি ফেলে এসেছি। ফাঁকে ফাঁকে মব করি কফিহাউজের মেঝে। আমার আপোস কার সঙ্গে? বুঝি না কিছুই। অফটাইমে খেতে পাই ডোনান্ট কিংবা স্যান্ডউইচ। একবার একটা কড়কড়ে ভাজা আলুর তৈরি হ্যাশব্রাউন খাবো বলে হাতে নিতেই, ডাইভওয়েতে সার্ফ করা সুলতানা নামের মেয়েটি দৌড়ে আসে,

— আপা, করেন কি? করেন কি?

আবাক চোখে চেয়ে থাকি। মেয়েটি সহানুভূতিশীল, এই শপে আছে দু'বছর ধরে। বলে, হ্যাশব্রাউন কারখানা থেকে প্রসেস হয়ে আসে। হ্যাম-ট্যামের সঙ্গে মিশে যায়। তাই আমরা খাই না।

আমি ওর অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাই না। হ্যাশব্রাউন রেখে একটা চিজ স্যান্ডউইচ চিবুতে থাকি। ও নিশ্চিত হয়ে সুনিপুণ হাতে শুকরের লাল মাংস পুড়িয়ে হ্যামবার্গার তৈরি করে, অপেক্ষারত কাস্টমারের জন্য। আমাদের অনুভূতিগুলো বড় অদ্ভুত, কখন যে কিসে আঘাত খায়, তা কে জানে! আমার অনুভূতিগুলো মরে যাচ্ছে। আমার কী দায়, এই সুদূর আমেরিকায় বাংলাদেশি বলে গলে পড়ার? বাংলাদেশ বুড়োর নিঃসঙ্গ সময়ে বাংলা কথায় ভরিয়ে তোলার। আমি তো বাংলাই বলতাম, লিখতাম। কিন্তু ওরা বলে আপনি কেন লিখেছেন, আমাদের গ্রামে মালোপাড়া নাই?

না, আমি কথা বলব না। খুব বুকের বাষ্প জমে উঠে, দমবন্ধ হয়ে এলেও বুড়োকে বলব না — চাচা, ভালো আছেন? দেশ ছেড়েছেন কতদিন?

লোকটি আমাকে ঘাঁটায় না, কিন্তু মনেমনে আমি নিজেকেই ঘাঁটাতে থাকি। হাইল্যান্ডে হাঁটতে হাঁটতে, কাস্টমারের কফির ঢাকনা শক্ত করে বসিয়ে দিতে দিতে। প্রবাস জীবনে আমার ডায়াসপোরা মনকে আরও কতভাবে ঢেকে রাখা যায়। আমার বেজমেন্টের কবরে শুয়ে শুয়ে ইঁদুরের হেঁটে চলার শব্দ পাই। রক্তচোষা ছারপোকার কামড়ে ঘুমহীন রাতে আমি কেবল ভাবতেই থাকি।

আমার পথের অলিতেগলিতে ওঁত পেতে ছিল অজ্ঞাত ঘাতক। আমার বন্ধুর লাশ পড়ে থাকে ছাপাখানার ঘোড়দৌড়ে। না, যারা আমাকে ভুল ভেবে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে অনর্গল, সদ্য ম্যাক্সিকো থেকে আসা চাকুরিপ্রার্থী আপন ভেবে স্প্যানিশ ভাষায় বলে প্রয়োজনীতার কথা। তাদেরকে আমি কেবল থামিয়ে দিই। বলি, আম নট স্প্যানিশ। ডু ইউ নো ইংলিশ? আম ফ্রম বাংলাদেশ।

ওরা নিশ্চিত এবং হতাশ হয়ে ফিরে যায়। আমি কেবল নিশ্চিত করি না বাংলাদেশ বুড়োকে। আমি কেবল নিশ্চিত করি না জ্যাকসন হাইটের বাংলা হোটেলের লোকদেরকে। আমি নিজেই তো আজ নিশ্চিত নই! মাসখানিক গৃহবন্দি থেকে কর্তৃপক্ষ যখন আমার হাতে এই আমেরিকার ভিসা তুলে দিলো, গাড়িতে করে প্লেনে তুলে দিলো, বলল, আপনার সুরক্ষার জন্যই আপনাকে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছি।

আজ আর আমার কি দায়, বাঙালি বলে মমতায় জড়িয়ে ধরার। অথচ মাঝে মাঝে আমার বড্ড বিচ্ছিরি মনে হয় ওদের সাদা-কালোর দ্বন্দ। হারলেমের পালাবদল, ওইখানেই জব কিছু খালি থাকে। খারাপ লাগে ওদের পার্কে ধেড়ে

ধূসর কাঠবিড়ালি দেখতে। আমাদের বেড়াডাঙ্গার বাড়িতে একটা নারকেল গাছের ফোঁকলে থাকতো ছোট্ট, হলুদ ডোরাকাটা খয়েরি কাঠবেড়ালি। দেখলেই আদর করে কোলে তুলে নিতে চাইতাম। আহা, আমার সোনালি চুড়ুই! ছোটআপার জ্ঞান যতই থাকুক, সুন্দর করে, সাহিত্য করে, চিঠি লিখতে পারতো না। এ প্লাস বি হোলস্কয়ার ভালো বুঝতো। সেজপা ছিল ঘুমকাতুরে। বড়পাকে লেখা চিঠিটা অঙ্কখাতার মধ্যে রেখেই ঘুমিয়ে যেত। মাঝরাতে সেই চিঠি চুরি করে টুকলি করতো ছোটআপা। আমি দেখে ফেলেছি। বলে দিতেই কানমলা খেতাম। ছোটপা এখন ডাক্তারি করছে। আর সেজপা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাংলা শিখেয়েই যাচ্ছে। ছোটপার এখনও আমার উপর রাগ, কাম্পিউটার সাইন্সে পড়ে কি দরকার অত গল্পলেখার। তোকে কে বলেছে বিচারবর্হির্ভূত হত্যার প্রতিবাদ করতে। আমি দেশ ছাড়তে চাইনি। সত্যি করে বলছি। বাসার ভেতরের বোনেরা ঝগড়ার তোড়ে ইংরেজি গালিতে মেতে উঠলে, আমার বৃদ্ধ মা ছড়া কটতেন, 'আমার পেটে হয়ে রে বাছা / কোথায় শিখলে পার্সি ভাষা'। মা নেই কিন্তু তাঁর ছড়াগুলো তো আছে, আমার কানের কাছে মা যেন মাঝেমাঝেই ফিসফিস করে বলে, 'নিজের টাকা হবে বলে পরকে যে দ্যাও ফাঁকি / পশুর সমান আত্মা তাহার, মানুষ বলে নাকি?'

আমি মানুষ হতে চেয়েছিলাম। পশুর মতো মরতে বা মারতে চাইনি। অথচ একে কি বলে বেঁচেথাকা! সারাদিন খালি কফির কাপ পূর্ণ করে অন্যের তৃষ্ণা মেটানো। বড় ক্লান্ত আমি। নিউইয়র্কের ঝকঝকে পরিস্কার আকাশ দেখে চোখ পোড়ে, আমার তুলট মেঘ, আমার ধূলট মেঘের আশায়।

ফিফথ স্টিটে এন ট্রেন ছেড়ে উঠে পড়ি এফ ট্রেনে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায় গন্তব্যে। মেট্রো থেকে নেমে গোথিক ড্রাইভ হয়ে হাইল্যান্ডে হাঁটতে হাঁটতে হিল সাইডে যাই, ঘরে ফেরার টানে। সারাদিনের ধকল, উঁচু-নিচু পথ বেয়ে নেমে যেতে যেতে আমি পার্কের মুখে চলে আসি। থিক হয়ে আসা লেকের পানি ছেড়ে, কাঠের গুড়িতে ঝিম ধরে বসে থাকা রাজহাঁস জোড়া, মানুষে ভয় নেই তাদের! ঠায় বসে থাকে। এখন আর আমার বলার বা লিখার কিছু নেই। এই দেশে সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, তাতে আমার কি? আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমার তো আর তেমন করে মতপ্রকাশই ঘটবে না। ইংরেজিটা আমার অতটা দখলেই নেই যে অনুভূতি-টনুভূতি জানিয়ে ট্রাম্পের রোষানলে পড়ব। ইংরেজিটা আমার মায়ের শেখানো বুলিই নয়, এর ভেতরের স্বাদ-গন্ধ আমি বুঝি না।

হঠাৎ দেখি দু'জন বাঙালি নারী আমাকে ফিরে ফিরে দেখছে। আমি বরাবরের মতো দেখতে চাই না। তাদের চাহনিতে ছিল চেনা চেনা ভঙ্গি, কোনো বাঙালি ভেবেই। কিন্তু যেন নিশ্চিত নয়, আমার ভাষা বাংলা! আমি দ্রুত পেরিয়ে যেতে চাই, কিন্তু ক্লান্তি আর হাইল্যান্ডে পথচলার শ্রান্তিতে মুখ ফসকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস! ও...হ্, স্পষ্ট কোনো শব্দ নয়। কেবল একটা ধ্বনি মাত্র। তবুও কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়েও থেমে গেল একজন মাঝবয়সি নারী, দুই হাত তার হুইল চেয়ারের পেছনে। চেয়ারে বসা বৃদ্ধ মা। নারীটি চকিতে ডেকে বসে — আপনি বাঙালি?

আমার দমবন্ধ করা নীরবতা, একটা দীর্ঘশ্বাস! তাতে কি বোঝা যায় এই শ্বাসে জমে ছিল পদ্মা-মেঘনা-যমুনার হু হু করা বাতাস। মানুষ কেন এমন স্নেহগন্ধ খুঁজে ফেরে! একটা দীর্ঘশ্বাসও কি বোঝে এখন তা বাংলার বাতাস সমেত ধ্বনি! আমার কতদিনের নীরবতা ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে আসে, হ্যাঁ।

হুইল চেয়ারে বসা নারীটির বয়স ৮২ হবে। দাঁতহীন মুখের চোয়াল বাতাসে বাড়ি খায়। বলে, থাকো কই?

— ওই চ্যাপিং কোর্ড।

— আপনি?

— হাওয়াপাড়া।

— হাওয়াপাড়া?

এবার মাঝবয়সি নারীটি বলেন, সিলেটের হাওয়াপাড়ায় আমাদের বাড়ি আছে। মা ভাবেন সেখানেই থাকেন।

বৃদ্ধ মা আবার বলে, হাওয়াপাড়া চিনো না?

— হুম চিনি। সে তো বহুদূর!

আমাদের চোখ ঝাপসা করে গুড়োগুড়ো তুষারপাত হতে থাকে। বহু আগেই জেনেছিলাম, তুষারপাতে বৃষ্টির মতো কোনো শব্দ থাকে না। কেবল নীরবে ঝরে পড়ে। আর ক্রমশ আমাদের দীর্ঘশ্বাসগুলোকে ঢেকে দিয়ে যায়। ক্রমশ নীরবতা ঢেকে দিয়ে যায় সফেদ বরফ।

শেকড়ের রঙ
নাহিদা আশরাফী

— কোন কোন রঙ মিলে জীবনের রঙ তৈরি হয়, জানো তুমি?

চমকে তাকালাম তেরো বছর বয়সী নাটালিয়ার দিকে। কৈশোর পার হয়নি। ছিপছিপে গড়নে আরো ছোট লাগে। ন' দশ বলে অবলীলায় চালিয়ে দেয়া যায়। ব্লন্ড চুল, গোলাপি আভার স্কিনে খুব অন্যরকম মায়া। এমন বাচ্চা মেয়ের মুখে এই প্রশ্ন বড্ড বেমানান লাগা উচিত ছিলো। কিন্তু কেন যেন লাগলো না। মনে হলো, প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক ওর জন্যে। ওর বসবার ভঙ্গি বাড়ির প্রাচীন সদস্যদের মতো, ওর পোশাকের রঙ কুয়াশার মতো, ওর চোখ শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো, ওর চুল মরুঝড়ে ডুবে যাওয়া কোনো প্রাগৈতিহাসিক শহরের ছেঁড়া পতাকার মতো। হঠাৎ ওকে দেখলে মনে হবে মৃত পাতার উপর ধূসর কোনো প্রজাপতি ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু তারপরও ওর থেকে চোখ ফেরানো যাবে না। কী একটা আছে এই মেয়েটির ভেতরে।

তখন বিকেল কেবল সোনালি ফ্রকে নিজেকে সাজিয়েছে। ইয়ারার দুই ধার বেয়ে পিঁপড়ের সারির মতো অফিসফেরত মানুষগুলো মেট্রোস্টেশনের দিকে ছুটছে। ছ নম্বর ব্রিজটার কোল ঘেঁষে আমি আর নাটালিয়া দুটো ফিশফ্রাই আর একটা সফট ড্রিংকস ও জিঞ্জার বিয়ার নিয়ে অলস ভঙ্গিতে বসে আছি বটে কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে চিন্তার আঁকিবুঁকি চলছে বেশ জোরেশোরেই।

— কই উত্তর দিলে না?

— আমার চেয়ে তুমিই বোধহয় ভালো জানো।

— জানি না বললে মিথ্যে বলা হবে। আর জানি বললে ভুল বলা হবে। তোমার ক্ষেত্রেও তাই। কিছু প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। কারণ প্রশ্নেরও কোনো রঙ নেই।

— কী যে বলো তুমি! বড় অদ্ভুত লাগে।

— পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর, জানো?
— জলের উপর
— জলের রঙ কী?
— জল বরাবরই রঙহীন। সবাই জানে।
— আমরাও তাই। এক নিরন্তর আলেয়ার পিছে ছুটছি। কী চাই আমরা জানি না, কী পাচ্ছি তার হিসাবও জানি না। আমাদের ডিমান্ড বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁয়ে দিচ্ছে, এমনটা ভেবো না। আকাশ ছুঁয়েছে অনেক আগেই। এখন অনন্তে ধাবিত হচ্ছে। আমরা রঙের দুনিয়ায় প্রবেশ করে আরো রঙ হারাচ্ছি। আমাদের ভাবলেশহীন মুখ ঢেকে যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে।

আমি চমকে তাকালাম। আস্তে করে বললাম, জানো শঙ্খ ঘোষ নামে আমাদের এক কবি আছেন। তাঁর কবিতায় আছে এমন কথা। নাটালিয়া জিজ্ঞাসার চোখ নিয়ে তাকালো। আমি অনুবাদ করে ওকে বলতেই ওর মুখে আলো খেলা করে উঠলো।

— আমি তো কবি নই। তাই হয়তো অমন গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কিন্তু দ্যাখো! তার এই লাইনগুলোই আমি বোঝাতে চাইছি তোমায়।
— নাটালিয়া, তুমি মাত্র তেরো। আর উনি কত বড় কবি! তার অভিজ্ঞতা দিয়ে যা লিখেছেন তা তুমি এই বয়সেই ভাবছো। এটা বিস্ময়কর! অবশ্য তুমি যা আলোড়ন তুলেছো চারদিকে! আমি তো এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমার পাশে বসে আছি আমি। তোমার সাথে এই সবুজ ঘাসে, সোনালি বিকেল পার করছি। স্বপ্নের মতো লাগছে!
— আমায় আলাদা ভাবছো কেন?
— ভাববো না বলছো! যে-মেয়ে মাত্র তেরো বছর বয়সে অনলাইন মার্কেটিঙে এমন তোলপাড় তুলে দিতে পারে, একমাসে যার ইনকাম দুই থেকে তিন লাখ ডলার, পত্রিকার বিজনেসপাতায় আইকন হিসেবে যার ছবি ভাসে, পৃথিবীর তাবৎ বিজনেস পার্সোনালিটির কাছে যে এক অপার বিস্ময় তাকে আলাদা ভাববো না! বরং বলতে পারো আমি আমাকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এমন একজনের সাথে আমি পার্কে বসে কথা বলছি।
— তুমি ব্যতিক্রম। আমায় চিনতে পেরেছো। অধিকাংশ বললেও কম বলা হবে। সাধারণ আমিকে কেউই চিনতে পারে না বলা যায়। নির্দ্বিধায় আমি এখানে বসে আরবারি এফ্লোটের বর্ণিল জীবন দেখি। ইয়ারার বুকে নৌকাবাইচের নৌকাগুলো দেখি। মজার কথা বলি তোমায়, একদিন সানডে

মার্কেটেও ঢুকেছিলাম। কেউ আমায় চেনেনি। আমারই বানানো খেলনাগুলো নিয়ে একটা শিশুকে খেলতে দেখলাম। আমি একটা হাতে তুলে নিতেই সে ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে নিয়ে নিলো। একটা দোকানে ঢুকেছিলাম। আমার সব টিনি টয় ওরা বিক্রি করছে। আমি একটা ধরতেই রে রে করে তেড়ে এল। এবার বুঝলে তো রঙের দুনিয়ায় মৌলিক নাটালিয়ার কোনো মূল্য নেই। গায়ে কিছু রঙিন পোশাক পরালে মুহূর্তেই আমি সেই মৌলিক নাটালিয়া থেকে সেলিব্রেটি নাটালিয়ায় পরিণত হয়ে যেতাম। তখন তাকে সবাই চিনতো। কিন্তু তুমি মৌলিক নাটালিয়াকে চিনেছো। এবার তুমিই বলো, তুমি ব্যতিক্রম নও?

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলবো এরপর? আমি তার ফ্যান কিংবা ফলোয়ার নই। একটা বিস্ময় যা আমাকে কোনোভাবেই ছাড়ছিলো না। নিজেকে সেই বিস্ময় থেকে বের করে আনতে চেয়েছি মাত্র। সত্যি বলতে নাটালিয়ার পাশে বসেও আমি ওকে চিনতাম না। চিনেছি ওর বা-হাতের জোড়া আঙুল আর বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে ইংরেজি 'এন' অক্ষর দেখে। অনেকদিন থেকেই মেয়েটা আমার মগজে ঝনঝন করছিল। প্রথমে সন্দিহান ছিলাম। তাই এত কাছে বসেও সময় নিয়েছি। খুটিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। অপেক্ষা করছিলাম ওর ডান হাতের 'বি' অক্ষরের ট্যাটুটা দেখার। সুযোগ আসতে খুব বেশি দেরি হয়নি। বাতাসের বেহায়াপনায় ওর ফ্রকের রুমাল হাতা উড়ে যেতেই সুস্পষ্ট দেখলাম ট্যাটুটা। নিশ্চিত হয়েই কথা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম।

— বিকেলটা সুন্দর। তাই না?
— হুম।
— একা এসেছো নাকি বাবা-মায়ের সাথে?
— এক্সকিউজ মি। আইম থার্টিন।
— জানি নাটালিয়া।

নাটালিয়া যতই ভাবলেশহীন থাকার চেষ্টা করুক না কেন তাকে যে চমকে দিতে পেরেছি এটা সুস্পষ্ট।

— তোমাকে স্থানীয় মনে হচ্ছে না।
— না নাটালিয়া (ইচ্ছে করেই নামটা আমি বারবার উচ্চারণ করছিলাম)। আমার বাড়ি অনেক দূরে। বে অফ বেঙ্গলের পাশে খুব ছোট্ট একটা দেশ। তুমি চিনবে বলে মনে হয় না।

— তোমার পূর্বপুরুষেরা কী ওখানকারই?

— হ্যাঁ।

— তাহলে ছোট বড় বিবেচ্য নয়। তুমি দাবি করতে পারো তোমার নিজস্ব একটা ভূমি আছে।

— তোমারও তো আছে। আচ্ছা 'এন' মানে নাটালিয়া বুঝলাম বাট ডান হাতের 'বি' আঁকা ট্যাটুটার মানে কী?

চুপ করে থাকা নাটালিয়ার দৃষ্টি তখন সাউদার্ন ব্রিজ পেরিয়ে দূর অন্ধকারে। খুব সূক্ষ্ম চোখে না তাকালে বোঝার উপায় নেই যে ওর গোলাপি ঠোঁটের কোণে কী আশ্চর্য বিষাদ! আর তখনই খুব অদ্ভুতভাবে আমার মনে হলো, এমন গোলাপি আভাও বিষাদ ঠেকাতে পারছে না। প্রসঙ্গ পালটে বললাম,

— তোমার গতকালের ইন্টারভিউটা ভালো লেগেছে। রঙ নিয়ে দারুণ বলেছো! তোমার অ্যানালাইসিস খুব ক্লিয়ার।

নাটালিয়া চুপ রইলো। ধরা দেবে কি দেবে না, এমন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চোখে ও বারবার আমায় দেখছিলো। আমার এই কমপ্লিমেন্টের উত্তরে থ্যাঙ্কিউ বলা মানেই নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়া। হয় সে নাটালিয়া, নয়তো না। কিন্তু আমি নিশ্চিত। আমার কনফিডেন্স লেভেলের কাছে মেয়েটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে নিজের সাথে যুদ্ধ করে হার মানলো। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ইয়ারার জলে রাখলো।

— আসলে কী জানো, আমরা রঙ ইউজ করি রঙহীনতাকে ঢাকতে। ঔজ্জ্বল্য মানেই কিছু একটা লুকোনোর বাহানা, অন্ধকার ঢাকার অপচেষ্টা। এত যে রঙ দিয়ে আমরা জীবন ঢাকতে চাই, পারি কই? প্রকৃতি তাই মাঝেমধ্যে সব ফ্যাকাশে করে দেয়। আমরা বিবর্ণতাকে ভয় পাই। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না। আমার তৈরি করা খেলনাগুলো তাই রঙহীন। আমি চাই আমাদের শিশুরা ওদের ইচ্ছে অনুযায়ী রঙ ব্যবহার করুক। তুমি কী বুঝতে পারছো আমরা প্রতিনিয়ত এমন সব রঙিন মুখোশে নিজেদের আড়াল করছি যা মূলত আমাদের কাম্য নয়। আমরা রঙের অধীন হচ্ছি, রঙকে আমাদের অধীন করতে পারছি না। আমি চাই আমাদের শিশুরা রঙকে ওদের অধীন করুক। তাই স্বচ্ছ খেলনা তুলে দিয়েছি। এবার ওরা ইচ্ছেমতন ওদের কল্পনায় সাজাক নিজেদের পৃথিবী।

— কিন্তু এমন চিন্তা তোমার এই ছোট্ট মাথায় এল কী করে? সবাই কী ভীষণভাবে গ্রহণ করেছে তোমার এই আইডিয়া। লক্ষ লক্ষ স্বচ্ছ খেলনা

অনলাইনে, স্টোরে বিক্রি হচ্ছে। বাচ্চারা কী আগ্রহ নিয়ে কিনছে! রাতারাতি কী ভয়ানক সাড়া ফেলেছো তুমি।

মৃদু হাসলো নাটালিয়া। সবুজ ঘাসে আধশোয়া হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ইটালিয়ান এক চিত্রশিল্পী আছে। নাম রবার্তো বার্নার্দি। ও সব স্বচ্ছ জিনিসের ছবি আঁকে। স্বচ্ছ জিনিসের বর্ণহীনতা ও এতে আলোর প্রতিফলন ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা বেশ কঠিন কাজ। এ ধরনের শিল্পীদেরকে বলা হয় ফটোরিয়ালিস্টিক চিত্রকর। তুমি কী বিশ্বাস করবে যে প্রতিটি শিশু এক-একজন ফটোরিয়ালিস্টিক চিত্রকর। ওর মনের ভেতরের সুস্পষ্ট ছবিকে ও নিজস্ব স্টাইলে রাঙাতে চায়। আমি শুধু ওদের সেই ইচ্ছেটাকে সম্মান জানিয়েছি।

এতক্ষণে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে নাটালিয়া। স্যামন ফিশটা কামড় দিয়ে মুখটা বাঁকা করে বললো, 'ফ্রাইটা ভালো হয়নি। কালার দেখেই বুঝেছিলাম।' মৃদু হাসলাম আমি।

— তুমি বুঝি খুব ভালো রান্না বোঝো?

— না। আমার বাবা বুঝতেন। আমাকে দুর্দান্ত সব রান্না করে খাওয়াতেন। বাবা যখন রান্না করতেন আমি পাশে বসে থাকতাম। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'জানিস তুতু', সরি তোমায় বলা হয়নি, বাবা আমায় তুতু বলে ডাকতেন। তো যা বলছিলাম। বাবা বলতেন, 'খাবার মুখে দেবার আগে চোখে ও নাকে দিতে হয়'। খুব অবাক হতাম তখন। বাবার মতে যে-কোনো ডিশ নাকি কালার দেখে আর ঘ্রাণ শুঁকেই বলে দেয়া যায় কতটুকু ভালো হয়েছে। একদিন বাবা ভেটকি মাছের স্টিম করে আনলেন। আমি দেখেই বললাম, 'এর তো কোনো রঙই নেই। খেতে নিশ্চয়ই ভালো হবে না।' বাবা হেসে উত্তর দিলেন, 'তুতু, ওর রঙহীনতাই ওর আসল রঙ'। তখন বুঝিনি, জানো। এখন বুঝি।

— এখন তোমায় রান্না করে খাওয়ায় না?

— না।

— কেন?

চুপ করে রইলো খানিক। ওর নীরবতা ঘাসের সতেজতাও ম্লান করে দিলো বুঝি। প্রায় দশ মিনিটের বোবা সময়কে খানখান করে নাটালিয়া কথা বললো,

— আমার বাবাকে ছেড়ে মা আমাকে নিয়ে এদেশে চলে এসেছিলেন। আমার বয়স তখন আট বছর। বাবা তার দেশ ছেড়ে, শেকড় ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে চাননি। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে আসতে চাইনি। বাধ্য হয়ে এসেছি। এখানে যাকে দেখছো তিনি আমার স্টেপফাদার। আমার মায়ের ধারণা ওরকম দেশে থাকলে আমি ব্রাইট ফিউচার মিস করবো। হায় রে! আমি তো মাকে বুঝাতে পারিনি আমি সবচেয়ে ব্রাইট থাকতাম ওখানেই। আমরা আমাদের মতো করে সবকিছুতে রঙ চড়াই। সেই রঙে অন্যকেও রাঙাতে বাধ্য করি। কী জীবন আমাদের! এবার নিশ্চয়ই আমার কালারলেস টয়ের মানে বুঝতে পেরেছো।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কী বলবো এই তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েটাকে। আমার বুকটা হাহাকার করে উঠলো। চোখ অজান্তেই ভিজে উঠলো। বিশ্ব যাকে মাথায় করে রাখছে তার বুক ভরা কী বিষাদ!

— তোমার এই সাফল্যে বাবা নিশ্চয়ই খুশি হচ্ছেন। দূরে থেকেও দেখছেন অবশ্যই।

— তা তো জানি না। এতটাই দূরত্ব যে সেখান থেকে তিনি কী দেখেন, কেমন দেখেন, আদৌ দেখেন কি না আমার জানা নেই।

— মানে!

— বাবা গত দু'বছর আগে হার্ট অ্যাটাকে চলে গেছেন। আমি আমার আঠেরোর অপেক্ষা করছি। তারপর ফিরে যাবো আমার বাবার গ্রামে। আমার শেকড়ের কাছে। জানো তো, পাতা যতই সবুজ হোক ঝরে পড়ার ভয় থাকে। শেকড় হয়তো রঙহীন তবু আঁকড়ে আমূল বাঁচা যায়।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'এসব তুমি কখনোই কোনো ইন্টারভিউতে বলোনি। আমাকেই বা কেন বললে?

— আমি এ প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলাম। তুমি যখন বললে তোমার দেশ বে অফ বেঙ্গলের পাশে ছোট্ট একটা দেশ। আমি তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, তুমি বাংলাদেশের মানুষ। আমার ডান হাতে যে ট্যাটুটা নিয়ে লাখো মানুষের হাজারো প্রশ্ন ওখানেই আমার শেকড়। ইয়েস, বি ফর বাংলাদেশ । আমার পিতৃভূমি। ভালো থেকো বাংলাদেশ । আমাদের আবার দেখা হবে।

এটুকু বলেই নাটালিয়া খুব ধীর পায়ে হেঁটে পার্কের মৃদু আলোয় মিলিয়ে গেল। বিবশ আমি একলা বসে থেকে থেকে দেখলাম আমার চোখের সামনেই সব রঙ মুছে গিয়ে কেমন অন্ধকার নেমে এসেছে।

মাসুম আহমদ

ব্লাকবোর্ড

তোমার শাসন মানি না বলে
তুমি বুঝতে চাওনি
রাজপথ
মিছিল
বিদ্রোহ
ভাষণ
রাজনীতির ছলাকলা
জয় পরাজয়
অথবা বেদখল হওয়া আমার রাষ্ট্র!

ঈগল পাখির মতো তোমার জন্যে
একশ ফুট উপরে ঘর বাঁধার যে-নকশা আঁকতাম
সে-নকশা ডায়েরির শেষ পাতায় গেঁথে
আমি যখন হাওয়ার সাথে মিশে যাচ্ছিলাম
তখন দেখলাম পর্দায় ভেসে উঠছে
বিদায়বেলায় কিভাবে চুম্বন অসমাপ্ত থেকে যায়।

আমি জানি লুকিয়ে লুকিয়ে কান্নার শব্দে
জেগে উঠবে হাজার বছরের ঘুমন্ত সাম্রাজ্য,
অথচ তুমি আর ফিরবে না
তোমার শাসন
তোমার রাজনীতি
আমার রাষ্ট্র
ব্লাকবোর্ডর সাদা অক্ষরের মতো করে মুছে যাবে।

প্রাচীন গ্রন্থে লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাত

পুতুল আমার বড় লাজুক, বড় নরম,
তার লেখা চিরকুট
বাতাবিলেবুর গন্ধে উড়ে যায়,
জল ঝরে পড়ার পর
পাতারা জলের গান গায়।

২

বুক থেকে যে-নদী সমুদ্রের দিকে যাবে বলে
পা বাড়িয়েছে,
সে-নদীর জলে ভেসেভেসে
কচুরিপানা ফুল ঘর বাঁধে,
সে-নদীর তীরে বয়ে যাওয়া লিলুয়া বাতাসে
উড়াউড়ি করে পুতুলের পাঁজরভাঙা বিষাদ।

৩

পুতুলের কান্না শুনে
সকালের পাখির মতো জেগে ওঠে
প্রাচীন গ্রন্থের ভিতর লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাত।

অরণ্যবাস

আমার ভিতরে একটা রঙধনু বাস করে
এই কথাটা যখন রাষ্ট্র হলো,
তখন সব মাযহাব
আমার বিরুদ্ধে চলে গেল।
অতঃপর আমাকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে
দরজার বাহিরে যেতে হয়।
আমি আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখি
আগুনের সাথে খেলা করতে করতে
জেগে উঠছে উইন্টারের প্রথম স্নোম্যান,
নির্জন কোনো গ্রাম দৌড়াতে দৌড়াতে
শহরের দিকে ছুটে আসছে,
আমার ভিতরের রঙধনুটা

কথা বলছে মেঘেদের সাথে।
তারপরেও,
ব্যস্ত নির্ঘুম কোনো একটা শহরে
মানুষ যে একা থাকতে পারে,
এটা কাউকেই বিশ্বাস করানো গেল না।
তাই আমিও কাউকে আর বলতে গেলাম না—
আমি পিথাগোরাসের সূত্র হয়ে
আরেকবার জন্মগ্রহণ করেছিলাম,
আমার একটা পুরাতন ইচ্ছা
ইজিপশিয়ান পিরামিডে বন্দী হয়ে আছে,
এবং এই পৃথিবীটা খুবই ক্ষুধার্ত!

রাহাদ আবির

খালার হলুদমাখা হাত

জীবনে অনেক হলুদ দেখেছি আমি। রঙিন, বিমর্ষ, সাদামাটা। শুভ্র হলুদ বকুলতলা, বসন্তের ম-ম করা রাঙানো হলুদ; কৈশোরের বেদনাময় ‘আজ আমেনার গায়ে হলুদ’ কিংবা ঢাকার এই কুঠুরিময় জঙ্গলজীবনের বসন্ত উদযাপন। কিন্তু হলুদ কোথায়? অনেক অনেক বছর আগে একবার খালার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার গ্রাম্য আটপৌরে সতিনের ঘর-করা খালা। বৃদ্ধ সোয়ামির মৃত্যুতে বছর ঘুরতেই যে অষ্টাদশী বিধবা। পাটা-পুতায় হলুদ বাটছিল খালা। আমার আসার সংবাদ শোনামাত্র দৌড়ে এসে আমার মুখখানি দুহাতে ধরে সে কী আদর! কেঁদেই ফেললেন, এত বছর পর আমারে দেখতে আইলি, বাজান? বেচারি খালা, মসলা-বাটা হাত ধুয়ে নেয়ার খেয়ালটাও ছিল না। কাঁচা হলুদে আমার মুখ তখন হলুদময়। হলুদের ঝাঁঝে চোখেও পানি টলমল। যৌবনে হলদে শাড়িতে শেফালি কতবারই তো দুহাতে আমার মুখ নিয়ে অমনি আদর করেছে, চুমু খেয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই গাঢ় হলুদমাখানো নিখুঁত ভালোবাসা? অনেক অনেক বছর পরে আবার খালাকে দেখতে গেলাম। খালা শুয়ে ছিলেন। চোখদুটো প্রায় গর্তে ঢুকে গেছে। পানখাওয়া মুখ। লালচে ঠোঁটের কোল ঘেঁষে জিহ্বাটা এলানো; ঠোঁটের সে-কোণে পানের লোল-পড়া একটি রেখা শুকিয়ে আছে। হা-করা মুখের ভিতর কালো কালো দাঁত। ও খালা, তোমার হলুদমাখানো হাতদুটি কোথায় আজ? খালা শান্ত, চুপচাপ শুয়ে আছেন।

ইকবালের বাসার ছাদে আমাদের আরেকবার বসা দরকার

হঠাৎ করে আজ মনে হলো আমাদের একজীবন শেষ। চমকে উঠি। ইকবালের বাসার আড্ডাটা আর হচ্ছে না তাহলে? একদশকের ঘড়ি ঘুরল মাত্র। এখনো ওর ঘরটা খুঁজলে ধুলোপড়া তাসের দু-একটা কার্ড মিলবে। ছাদের চিলেকোঠায় আহাম্মকি খরগোশ-পালন-প্রজেক্ট এর

খাঁচাটা তো আর সরানোই গেল না। অথবা আমাদের চমৎকার সমিতির খাতাটা কি একেবারে আস্তাকুড়ে হারিয়েই গেল? চেগা ইমরান, যে নাকি এখন অস্ট্রেলিয়ায়, ইস্তিরি বন্ধক রেখে যাকে ঋণ দিয়েছিলাম, টাকাটা পুরো শোধ দিয়েছিল? ইফতার পার্টিটা হচ্ছে না কয়েক বছর হয়। বাঙালি বলে কথা — উৎসব-পাগল। রোজার ধার ধারি না এক শালাও অথচ খাবার বেলায় ষোলোআনা। নারিন্দার ঘোল ওরফে মাঠা নিয়ে প্রতিবারই কাড়াকাড়ি চলত। প্রেমে পড়ে মণ্ডলটা এমন আমূল বদলে যাবে কে জানত। বাবার সিন্দুক থেকে চুরি-করা-টাকায় সে আমাদের দেদারসে রেস্টুরেন্টে খাইয়েছে; ওর পকেট দিয়ে এখন একটা সিকিও এদিকওদিক হয় না। একে একে সবাই গোপনে-অগোপনে কে কবে বিয়ের ফাঁসে ঝুলে পড়ল, খবরই নেই। অবশেষে জগাটাও করি করি করছে। সেদিন বলছিল, খুব একা হয়ে গেছি রে দোস্ত, একই শহরে থাকি, কারো সাথে দেখা হয় না, সবাই এত ব্যস্ত, তুই দেশে ফিরে আয়, বিয়েশাদি তাহলে বাদ। ফিল্ম তো আমাদের বানাতেই হবে, না? শাকিলটার জন্য মায়াই হয় — তিন তিনবার মটরবাইক অ্যাক্সিডেন্ট। পইপই করে মানা করেছিলাম। দাঁতগুলো তো গিয়েছেই, জানটা কেবল রক্ষা শেষবার। হ্যাঁ, অনেককিছু ঘটে গেছে, অনেক সময়। আমাদের আরেকবার, আর একবার সবার ইকবালের বাসায় বসা দরকার। অনেক বোঝাপড়া আছে, চেনার বাকি আছে। অন্তত সবাই একটা দিনের জন্য একসাথে হওয়া, বোঝাপড়া নাহয় বাদই দিলাম, কয়েকটা মুহূর্তের হাসিঠাট্টা হলো, হিসেবনিকেশটা নিজের ভিতর নিজেই করলাম।১৩

রিকশায় মাতাল সান্ধ্যভ্রমণ

এক চমৎকার সন্ধ্যায় মদ খেয়ে রিকশায় বাড়ি ফিরছি। মাতাল পানীয়র পর ত্রিচক্রযান ভ্রমণের সুখই আলাদা। একটু বাদে বাদে গানের দু-এক কলি ভাঁজছি, চেচাচ্ছি। যেন চলছি পঙ্খীরাজের পিঠে। টগবগটগবগটগবগটগবগ। চারপাশে জীবনের কোলাহল চোখে টলমল ভাসে। পঙ্খীরাজ চলে তুফানবেগে। পেছনে পে-পু পে-পু বাস-ট্রাক থোড়াই কেয়ার করে। হঠাৎ ও কী! হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। পঙ্খীরাজ আচমকা থেমে যায় যে? 'শালা শুয়োরের বাচ্চা! মেরে ফেলছিলি তো, দেখে চালাস না?' গোটাকতক থাপ্পড় কিল ঘুষি বসিয়ে দেই হারামজাদার পিঠে। নোংরা ঘর্মাক্ত পিঠটার জন্যই যদিও রক্ষে, নইলে পড়েই তো...। গন্তব্যে পৌঁছে ভাড়াটা বাঁ হাতে বাড়িয়ে দেই ব্যাটার দিকে, 'নে'। আবার দ্যাখো শালার বেয়াদবি, বাঁ হাতটাই বাড়ায় সেটা নিতে। 'শালা ইডিয়ট, ডানহাতে টাকা নে।' মাথা নিচু করে

দাঁড়িয়ে থাকে জোয়ানটা। ডানহাতের দিকে চাইতে দেখি শার্টের হাতাটা ন্যাতানো, ঝুলছে। হাতটা নেই।

পেট্রোলপাম্পে তেল নিতে গাড়িটি থামেনি

...পার্লামেন্টে আমাদের কথা বলতে দেয় না, তাদের এমপিরা ফাইল ছোঁড়াছুঁড়ি করে...*বিবিসি*র খবর হচ্ছে নাকি? অ! তা কথা বলতে পারলে কী করতে শুনি? জনগণকে কোলে বসিয়ে...ওহ-হো, বাসের কন্ট্রাক্টর থেকে চারটাকা নেয়া হলো না...কী যে হয়েছে আজকাল, মাথাটাই গেল...টেম্পু নেই—সিএনজি আমদানি হচ্ছে, না? হেঁটেই যাই...কালকে আজিমপুরের টিউশনিতে যেতে হবে, ছেলেটার মা খুব ভালো...আর ঐ কল্যাণপুরেরটা আস্ত একটা কীট।...বাবার চশমাটা এ-মাসেও কেনা হলো না, ডাক্তারব্যাটা তো বলেই খালাস; কত লাগতে পারে?...সাফিন কয় টাকা পায় যেন, দুইশ? না দুইশ দশ?...লাইব্রেরি থেকে ওরিয়ানা ফাল্লাচি মেরে দিয়েছি, লোকটা একদম ধরতে পারেনি হেঃ হেঃ...মাথাটা ভেজা কেন? বৃষ্টি পড়ছে! দূর শালা কী যে হয়েছে আজকাল মাথাটাই ফেল...। তোর মায়রে আমি...কে খিস্তি আওড়ায়? কোথায় এলাম? যাহ এ যে বাসার রাস্তায় এসে পড়েছি, এত তাড়াতাড়ি এলাম কীভাবে? কী যে হয়েছে আজকাল...আচ্ছা, তোর মুখটা দেখতে কেমন ছিল রে? কতদিন হলো ঘর ভেঙেছে, ছয় মাস? না না, আরও বেশি হবে, দেখছিস এর মধ্যেই সব বেমালুম ভুলে গেছি; অথচ বিদায়ী ট্রেনের মতো তোর চলে যাওয়া দেখে আমি আত্মহন্তারক হতে চেয়েছিলাম।

লায়লা ফারজানা

প্রান্তিক

ছোট লাল ব্যাগে
বাচ্চাটা নিয়ে ঘুরি।
সাদা ডায়পার, খালি গা, ফর্সা শরীর, কালো চুল।
ঠিক আছে তো?

সিকিউরিটি গেট ক্রস করেই ব্যাগ খুলে দেখি
পাশ ফেরা শরীরটা নিথর, ঠান্ডা,
একটি শিরশিরে অনুভূতি বয়ে গেল মেরুদণ্ডের ঠিক মাঝ বরাবর।
হাতের তালুতে তুলে নিলাম তাকে, ঝাঁকি দিতেই চোখ নাড়ালো,
গোলাপি জিভ ছুঁলো গোলাপি ঠোঁট।

ভাবতে অবাক লাগে আমার।
সেগুলো সবই ছিল ঘৃণা! কত কষ্টেই-না সে ছুঁয়েছিল আমায়!

প্রাক্তন

জানি না কী বলতে চেয়েছিলে —
নভেম্বরের মাঝামাঝি এক শেষ বিকেলে
বাদামী চোখে ছিল কষ্ট।
মুখের ডানপাশ রক্তাক্ত, সবুজাভ লাল
দুপায়ের মাঝখানে বৃত্তাকার লৌহপাতে আটকানো
দুটি টাইটেনিয়াম ল্যাগ-স্ক্রু।
কশেরুকা ঘিরে কালো ওয়্যারে থকথকে ফ্লুইড

ভেবেছিলাম মরে গেছ।
কিন্তু সারাটা পথ দেখিয়ে নিয়ে এলে।

কমলা বাদামী। — শুষ্ক ম্যাপল পাতা।

নীল ময়ূর থেকে সকালের রোদ্দুর পর্যন্ত
অ্যালগোরিদমের ফোটোনিক প্রসেসরে

কী অসাধারণ প্রাণশক্তি!
নাচতে নাচতে। কখনও উইন্ডশিল্ড, কখনও ড্যাশবোর্ড,
কখনও কালো পিচের রাস্তার বিপরীতে সাহসী সবুজ।
হলুদ সূর্যের মুখোমুখি।

এক্সিট ফিফটি থেকে ফাইভ
হাইওয়ে-ব্যারিয়ারের সর্পিল প্রান্তে
জানালা খুলে দিলাম
যেন কাছাকাছি থাকতে পারি —
যেন হাত বাড়ালে আমার হাতে
রাখতে পারো তোমার হাত।

ইভানের ঘোড়ার মতো ছুটছিলে।
সোনালি কেশর উড়িয়ে
কালো ফুলকি দেয়া প্রজাপতির মতো।
আস্ফাল্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে

অথচ আমি ভেবেছিলাম তুমি মরেই গেছ!
তুমি মৃত ম্যাপলের পাতা —

ভায়োলেট

জানালায় তোমার ফিরে আসার অপেক্ষা
বইয়ের পাতায় তোমার চুল
তোমার প্রথম চাকরির বেতন
তোমার প্রথম মুগ্ধতা
তোমার কাপড়
তোমার টি-শার্ট
তোমার গায়ের গন্ধ

ডেড লিভস
একটি প্রচলিত ধারণা :
ভালোবাসা

বার্সেলোনা

অন্ধ তোমার বার্সেলোনাপ্রেম
জ্যাকারান্ডার ডালিমদানার ভোরে
আকাশ উজাড়, উড়াল দিয়েছে পাখি

একই মানুষ একই আলিঙ্গনে
ফুল ঝরেছে ভেজা চুলে কবেই
সবই এখন শুভঙ্করের ফাঁকি

এইভাবে এই একলা আষাঢ় মাস
অলঙ্কারের অহংবোধে একা
মন ভেঙেছে মনের মনস্তাপে
এইভাবে তাই একলা বসে থাকা

সোনালি টিউলিপ

আমি আমার পালক তুলে ফেলেছি
আর সব ভালো মেয়েদের মতো
এখন আমি অনেক বেশি শান্ত

মেরুন ছায়া গাছের ক্যাথেড্রালে
সবুজ বোতল নোনা জলে ভরি
নিকোটিনের হলুদ ডানার দামে
তুমিও কি ক্লান্ত —

তীরের পারে শহরটা আর নেই
পায়ের পাতায় সাদা বালির স্তূপ,
খোদাই করা পথের শেষে
পপি ফুলের ঘ্রাণ —

জলের পরে মুখটা আমার নয়
জ্যাকারান্ডায় আকাশ যেমন প্লাম

জ্যাকারান্ডা

সেরুলিয়ান আকাশে উড়ন্ত রাজহাঁস!
বৃষ্টির তিরে খসে পড়েছে পালক!
পা নামিয়ে আলতো দাঁড়ায় অর্ধনমিত মুখ।
জেনশিয়ান বেগুনী প্রতিবিম্বে জ্যাকারান্ডা।

শুয়ে আছি ঘাসের সমান্তরাল।
বিশাল মাঠে সবুজ! আদিগন্ত সবুজ!
কেন্দ্রের বৃত্তে অভিকেন্দ্রিক লাল পিয়ানো।
দূর আকাশে, চাঁদকে ঘিরে অশরীরী নক্ষত্রের
গোপন কথা —

বেজে চলেছে সোনাটা! অস্থির সোনাটা।
চন্দ্রালোকের সোনাটা!
একাকার ঘোরের
একাই নিজের সাথে —

তাই ভাবি, ভাবতে ভালো লাগে।
বিশাল মাঠ! আদিগন্ত সবুজ ঘাস!
শুয়ে আছি ঘাসের সমান্তরাল।

উর্ধ্বমুখি নাক বরাবর
আকাশে শূন্য পাখি!

সন্তর্পণ ভৌমিক

বিরাট বিরাগ

অপূর্ণ ইচ্ছার কাছে তোমাদের খাদ্য মনে হয়
বিশেষত পশু ও শিশু, পুংবৃদ্ধ, নারী কখনো

কার বুকে ধাতুবীর্য মরিচার মতো
ফেনিল মেঘের ন্যায় খর উন্মাদিনী
কার চোখে রাতভোরে হতাশাপ্রবল
কে আজ হাঁটছে রাতে উদ্দেশ্যনিপুণ

আমি কি শ্বাপদ হয়ে প্রেম যাচি ভিক্ষুণীর হাতে
প্রবল প্রকার শোকে, হেরিব দুজনে আহা মেঘবৃষ্টি হয়ে।

সরল তুমি, মানুষ

রক্তগন্ধি বৃষ্টি নামে, তুমুল বর্ষণ
নোনা মানুষের গন্ধ তাতে মিশে
স্নান করছে ময়ালবন্য, পাথরে দাঁড়ায় কাক
শোকদুঃখঅল্পমোহে আঁধার গড়ছে রাত

অবোধ নদীর উপত্যকা পেরোল বান্ধব
রাঙা ভোরে আকাশরঙা তোমার দীর্ঘদিন
ছাই হয়েছে আমার অভিশাপে
দীর্ঘ পথ অনিদ্রাতে একাই পেরোলে

আকাশবাণী তখন শোনা যায়
নগ্ন গৃহের মানুষ তুমি সরল হয়েছো।

দৃশ্যপটক্ষয়

রাত দেখি খণ্ড হয়ে আসে
যখন ঘুমোও তুমি উপপত্নীচরে

আষাঢ়ি বর্ষণ দেখি থেমে যায় হঠাৎ
বহুগামী হয়েছো কি? খুলেছে বরাত?

আমি নীলতরঙ্গের পূর্ণব্যাস দেখি
নীলের ডানায় ভর দিয়ে আজ নাচছে ব্যালেরাণী।

এ কেমন, কেমন তুমি

তোমার মুদ্রাগতি স্থির হয়ে আছে
অবনত নক্ষত্রের পতনের মতো
কারা যেন ঈশ্বরের ঘাটে
খুন হয়ে থাকে রোজ দলিত বিকেলে

কোথায় বিশ্বাস যেন হারিয়েছে খেই
তাই তুমি শ্মশান-শর্তে, দাঁড়াও
আমার ঘোলা আঁখির 'পরে

আমি খালি পায়ে বারান্দায় হাঁটি
আর দিনরাত গ্রহান্ত পেরিয়ে
নুলো কোনো ভিখারির অপেক্ষায় থাকি।

পাথর সহিস

নিরেট মন্দিরে তুমি
বহুকাল বসে আছো
পরাঙ্মুখ নক্ষত্রের উচ্ছিষ্ট যেমন

দিন আসে রাত যায় দেবতার অপেক্ষা তোমার
বিকৃত হয়েছো তুমি
জল সব উবে গেছে কমণ্ডলু থেকে
হাতে কি শিকড় ওঠে
পায়ে কি পাথর বাঁধা আছে?

জিভ নাকি খেয়ে গেছে নরকের সরীসৃপ এসে

এখানে বিশাল দাওয়ায় নরবলী হবে হবে শুনছি বহুদিন
আহা, যার সাথে কথা বলি সে তো দেখি মস্তকবিহীন।

আসন্ন অতীত

তুমি অতিঅন্ধ অতীতের কথা ভাবো
যেখানে সুখের সাথে শোককল্প সময় নিহিত
আর থাকে অন্ধকারে সাপমগ্ন দীর্ঘ যাতায়াত
যেখানে অস্থির হয়ে থাকি
ক্রমশ কাপুরুষ জেগে উঠবে বলে

নদীগন্ধী স্থিরতা আসছে
অতিগূঢ় ধবল প্রবাহে
আমি বাণবেগে ভেসে যাই রহস্যদুয়ারে
খুঁজছি অমূল্য রত্ন পাথরপ্রহারে।

হাসান রনি

বিনির্মাণ

মাড়াই শেষে খুরের ফাঁক দিয়ে
ধেয়ে আসা ত্রিকোণ আলো
বিনির্মাণ করো আমায় খড়ের মতো
আর ফেলে রাখো গোয়ালঘরের পেছনে
আমার জন্য অপেক্ষায় স্ফীতবক্ষের অবাধ্য পাখিরা...
দুটো ছেলে
আদর করে যাদের আমি
সাদা আর কালো বলে ডাকি
আর প্রিয়তমা স্ত্রী বিন্নি চালের গন্ধ তার শরীরময়
কত রাত আমি কইভাজার মতো
ঘুমিয়েছি তার পাশে, ঘুম পাড়াতে শেখেনি সে
দৃশ্যপটে এসেছে কেতুর চোখে
মাটি কর্ষণরত কৃষককে,
যে ভুলে যায়নি
গতরাতের সঙ্গমকালীন সফলতা,
আম্রপালীর ঘরে বুদ্ধের গমন।

তখন ঊনসত্তরটি বিতাড়িত বোরাক
আমার কাছে এসে হয়ে যায় গরুর গাড়ি আর
ঝরে-পড়া সূর্যরশ্মি বাজপাখির ঝাপটায়
ছড়িয়ে পড়ে আমার চারপাশে
যারা আমাকে ঘিরে ধরে সমস্ত গ্রীষ্মকাল,
তুষারে জমে মাংস,
শীত আসে কালো পশম ধরে ।
দূর থেকে আমি একে বলি —

শ্বেতশুভ্র কবুতরগুলো গিলে ফেলবে এসব ।

যে-কেউ যেন খুঁজে পাবে আমায়
ও আমার আত্মা প্রিয়তম আমার
গাঢ় হলুদরঙা মৌমাছিগুলো
কূজনে কূজনে মথিত করে রাখে,
জলদর্পণে নামে নৈঃশব্দ্য
আর মন্থর চাঁদ পোড়ায় মেঘের পর্দা
উষ্ণ আপেলে পার হই কল্পস্বর্গ
প্যাপিরাসের নিচে বসে লিখি ব্যাধি, প্রার্থনা
আর কিয়দংশ দূরে থেকে
পাশাপাশি খচ্চরে চড়ে যান নীলনদের রচয়িতা।

লুণ্ঠনের বন্দর

হাড়মাংসের লুণ্ঠনের পর তার জাহাজ ভেড়ে যেখানে রাত বদল করে বন্দর
বহুগামী পাটাতনে অক্ষরের প্রতিলিপি
মরমে বিঁধে আছে তার অশ্বত্থের সমান না হওয়া

বসে আছে পাখিরা নিজেদের জেনে
দূর ভাবা বাড়িগুলো বিষণ্ণ অশোকের মতো
যার শরীর ছোঁয় ঋতুজানা বাতাসেরা

আমি কি সে-ই যে বিঁধে আছে মাছের মতো? তার ঠোঁট শুধু ভেতরে টানে
উপরে আলোখোলা আমারই মতো যে খোঁজে গহীন
যেখানে মত্যু কিছুটা ভান করে, হরিণের চোখে আঁকা হয়ে যায় বাঘের মুখ

প্রদাহ থেকে ওরাই কাছাকাছি চলে আসে
আমার স্ফটিকের কাছে, যে নিজেকে ধরে নেয় মৃত্যু
দুয়ারের ওপারে শুরু আমারই কাছে আমার যাওয়ার দিন।

ফেরার মরশুম

ফেরার মরশুমে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে জাহাজগুলো
মাছেরা পা লাগিয়ে পাথরে পাথরে দেয় লাফ
সঞ্জীবনী সুধা কোন্, খোঁজে আমাকে পিতলের মৌমাছি

বিস্মরণের ধনুক শরীর কালও ধরা ছিল গদ্যের জীবন
পেটমোটা নৌকার মতো করে বাতাসের কণ্ঠে

যেসব উদ্দেশ্যে সমুদ্র ফিরিয়ে নেয় তার বিষবালু
খুলে খুলে আসা দৃশ্যে
আলো ঝেড়ে তুলে ধরে সদৃশ আয়না
এক হাত অন্ধকার ফিরিঙ্গি
কেঁপে কেঁপে ওঠে বউমাছ
গতির শূন্য, না-দেখা দৃশ্যের কাল
আত্মহত্যাপ্রবণ বালুরা পাড়ে আসে।

একপ্রস্থ দূর আলোর আলস্য, ছায়ার ভেতর মেয়েরা চলে যায়
তার চেয়ে ভারী আয়ু,
ফের ফেরার মরশুম,
ফেরার মরশুমে বাদামি ক্ষেত জুড়ে উড়ালি মাছি
ঘুমের মতো এগিয়ে আসে আমার দিকে।

মাহমুদ দারবিশের বক্তৃতা

ভাষান্তর : এমদাদ রহমান

২০০৮ সালের ১৩ আগস্ট ফিলিস্তিনের রামাল্লায় মাহমুদ দারবিশের লাশবাহী গাড়িটি যখন ধীর গতিতে চলছিল, অশ্রুসিক্ত হাজারও মানুষের হাঁটার গতিও সেদিন ধীর গতির ছিল, তাদের বুকে ছিল প্রতিরোধের সেই অদ্ভুত কবিতা — *তুমি চাইলেই সোনালি রোদ, তুমি চাইলেই রূপকথার পুতুল, তুমি চাইলেই ঘর; আমার কিছুই নেই...*

আজীবন উদ্বাস্তু ছিলেন দারবিশ, তাই তিনি পৃথিবীর সমস্ত উন্মুল উদ্বাস্তু মানুষের মুখে ভাষা দিয়ে গেছেন; জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছে লেবাননের শরণার্থী শিবিরে, তারপর — কায়রো, মস্কো, বৈরুত, দামেস্ক, তিউনিস, প্যারিস, হিউস্টন। মানুষের যখন নির্বাসনের ভাষা খুঁজতে হলো, দারবিশ লিখলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ডানাহীন পাখি'; লিখলেন অদ্ভুত এক স্বপ্নের কথা — পৃথিবীর হৃদয় তার মানচিত্রের চেয়েও বড়! তিনি প্রতিরোধের কবি। তাঁর কণ্ঠ এককের নয়, কোরাসের; যারা জন্মভিটে হারিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, সেই অজস্র উদ্বাস্তু মানুষের কণ্ঠ মাহমুদ দারবিশ। তাঁর কবিতার ভাষাই তাঁর দেশ, বহু মানুষের দেশ, প্রতিরোধের ভাষা।

নেদারল্যান্ড সরকারের 'প্রিন্স ক্লস সম্মাননা'-২০০৪ গ্রহণের দিনে, ২০০৪ সালের ১ ডিসেম্বর, রয়েল প্যালেস অ্যামস্টারডামে মাহমুদ দারবিশ তাঁর বক্তৃতায় এই কথাগুলো বলেছিলেন —

ইওর ম্যাজেস্টি...ইওর রয়েল হাইনেস...ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, কবিতা-যাপনের এই অসামান্য দিনে, আজ এখানে, আপনাদের মধ্যে স্থান পাওয়া আমার জন্য আনন্দ ও সম্মানের বিষয়, এমন এক অদ্ভুত সময়ে আমরা শুধুমাত্র কবিতাকে যাপন করছি যখন তাকে বিচ্ছিন্ন ও অনাত্মীয় মনে করা হয়।

যে-কবিকে আজ এখানে সম্মানিত করা হচ্ছে, তার হয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি শঙ্কিত, কেবল এই কারণে যে এখানে কবি ব্যক্তিটি তিনিই যেখানে তিনি নিজেকে নিয়ে কথা বলছেন, এই ক্ষেত্রে, তিনিই নিজেকে সম্বোধন করছেন। কীভাবে একই সঙ্গে 'আমি' এবং আমার আমির 'অপর' মিলে আজ এখানে মিলিত হয়েছি? দিন শেষে কবিতা কি কবির 'আমি' এবং তার 'অপর'-এর মিলিত স্বর নয়?

কোনও একজন লেখক যখন এমন একটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা পান, তখন এই সম্মাননাকে শুধুমাত্র তার একক প্রচেষ্টার স্বীকৃতিই বোঝায় না, এই সম্মাননা বরং একটি বন্ধনেরও উদযাপন যা তাঁর একক সৃষ্টির কাজকে অন্য লেখকদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে; এ সম্মাননা যে-কোনও লেখকের জন্য একটি বিশেষ নান্দনিক এবং মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি যার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি বিপুল বিশ্বসাহিত্যকে হয়ত একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিতে পারে যা সাহিত্যকে কোনও বিশেষ কেন্দ্রে বন্দি করে না, দূরবর্তী প্রান্তদেশে মুদ্রিত সাহিত্যকেও ছোট করে দেখে না।

মাননীয়া, আজ যে-সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে তা একই সঙ্গে আমার আবার আমারও নয়। এ সম্মাননা আমি গ্রহণ করেছি কারণ কবিতাগুলোয় আমি মাহমুদ দারবিশ, স্বাক্ষর করেছি। কিন্তু স্বাক্ষর করলেও, এ কবিতা কেবলই আমার নয়, কারণ এ কবিতাগুলোয় অনেক কণ্ঠস্বর এবং হারানো স্থানের কথা আছে যাকে এখন আর কেউ মানচিত্রে খুঁজে পাবেন না...এ শুধু আমার একার কণ্ঠ নয়, বরং তা অনেকের এমন কিছু কথা যা ভিকটিম হিসেবে নিজেকে এবং পুরো বিশ্বকে বলা, যা এমন কিছু কথা আক্রান্ত ব্যক্তিটি যেখানে নীরবতাকেও স্বীকার করে না, এমনকি মৃত্যুকেও স্বীকার করতে সে আর রাজি নয়, এমনকি স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তির আশার ব্যাধি থেকে নিরাময়েরও আশা সে আর করতে চায় না। এখানে, আমার যে-কণ্ঠকে স্বতন্ত্র কণ্ঠ হিসেবে পাওয়া যায় তা কেবল কবিতার ছন্দ ধরে রাখবার একটা উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়!

একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মারা যেতে পারেন : নির্বাসিত হয়ে, কারাগারে, এমনকি তিনি মারা যেতে পারেন তাঁর জন্মভূমিতে যা দখল ও নিপীড়নের ফলে ইতিমধ্যেই দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্ভবত কবিতাই সেখানে একমাত্র আশ্রয় যা আমাদের মাঝে মায়াজাল বিস্তার করে, আমাদের ভেতরের জাদুময়

বিভ্রমকে লালন করতে শেখায় : কীভাবে বারবার এবং বারবার নিজেদের মধ্যে থেকেই নতুন করে জন্ম নেওয়া যায়, নিজেদের আত্মার ভেতরের শব্দদের দিয়ে গড়ে তোলা যায় এমন একটি আন্তরিক পৃথিবী, এমন একটি উপাখ্যানের পৃথিবী যা বাস্তব নয়, যা এখনও আমাদের স্বপ্নেই থেকে গেছে; আমাদের আত্মার ভেতরের এইসব শব্দকে ব্যবহার করে বিবদমান পক্ষদের নিয়ে স্বাক্ষর করা যায় একটি শান্তিচুক্তি, যে-চুক্তিটি হবে স্থায়ী শান্তির দিকে যাত্রা, আমাদের সকলের জীবনের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষা — শান্তি।

আপনি জানেন যে আমি ফিলিস্তিন থেকে এসেছি। ফিলিস্তিন — কী উত্তেজনাপূর্ণ এক নাম! দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট এবং প্রতিটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত এই নাম। এই নামটি আমাদের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে একটি প্রতি-আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তোলে, করুণা আর ক্রোধকে চাঙা করে তোলে। আমাদের কল্পনায় থাকা প্রাচীন ফিলিস্তিন, যাকে 'ভালোবাসা ও শান্তি'-র দেশ বলা হয়, সে আমাদের নবিদের মা, পৃথিবী ও আকাশের মিলনস্থল, রক্তপাত ও কান্নামুখর প্রকৃত ফিলিস্তিনের সঙ্গে যা কোনওভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এই ভূমিখণ্ড থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে চিরদিনের জন্য, এখানে জনগণ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত; এ ভূমি ভালোবাসাকে অস্বীকার করেছে কারণ এর জনগণ ন্যায়বিচারবঞ্চিত; এ ভূমি সুন্দর আগামীকে অস্বীকার করেছে, কারণ এর দখলকৃত বর্তমানকে ঘৃণার দীর্ঘ এক প্রাচীর ঘিরে রেখেছে যা এর জনগণকে দিনের পর দিন আশা থেকে বঞ্চিত করে।

ফিলিস্তিনি হওয়া খুব কঠিন আর একজন ফিলিস্তিনির জন্য কবি হওয়া আরও কঠিন! শব্দ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যকার অবারিত সমন্বয় বিঘ্নিত না করে কীভাবে তিনি গান গাইতে পারেন? কীভাবে তিনি একই সময়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং তার উপযোগিতা নিয়ে ভাবতে পারেন?

ভাষাকে বিবরণীতে রূপান্তরিত না করে কীভাবে তিনি ভাষা দিয়ে দেশের কথা বলতে পারেন? কীভাবে তিনি কিংবদন্তির চাপ থেকে বাস্তবতাকে রক্ষা করবেন, কীভাবে তিনি বাস্তবতার চাপ থেকে কিংবদন্তিকে রক্ষা করবেন, ইতিহাসের অংশ হয়ে, একজন সাক্ষি হয়ে একই সময়ে তিনি কীভাবে এতকিছুর বিপুল চাপ সামলাবেন? সময় আমাদের প্রজ্ঞাবান হওয়ার শিক্ষা দেয় আর ইতিহাস আমাদের আয়রনি শেখায়। একজন কবি কীভাবে তাঁর ভাষা (কাউন্টার-ল্যাঙ্গুয়েজ) দিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন? নির্বাসনকে কীভাবে

তিনি সুপ্ত স্মৃতিতে পরিণত করবেন? তিনি কীভাবে — ফরাশি কবি রেনে শার যেমনটি বলেছেন — শত্রুকে প্রতিদ্বন্দ্বীতে রূপান্তরিত করবেন এবং কীভাবে তিনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইয়েটসের কবিতার দুটি লাইন মুখস্ত করতে রাজি করাতে পারবেন :

Those that I fight I do not hate,
Those that I guard I do not love;

এমন কঠিন সব প্রশ্ন...কেবল সাহিত্যই দিতে পারবে এইসব প্রশ্নের উত্তর...আমি জানি না...আর না-জানাটা কী যে রোমাঞ্চকর যেখানে কবিতা হলো অজানার দিকে অ-বি-রা-ম যে-তে থা-কা।

সৈয়দ গুলাম মহিউদ্দিন আহমেদ বিন খইরুদ্দিন আল হুসেইনির দূরদর্শিতার অভাব

অতীশ চক্রবর্তী

আজকে আমি সৈয়দ গুলাম মহিউদ্দিন আহমেদ বিন খইরুদ্দিন আল হুসেইনি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। ১৮৮৮ সালে সৌদি-আরবের পবিত্র স্থান মক্কায় তাঁর জন্ম হয়। ৬৯ বছর বয়সে দিল্লিতে ১৯৫৮ সালে তিনি মারা যান। দিল্লিতেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। ভারতের স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে এবং স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে তিনি একজন প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় হিসাবে সকলের কাছে সম্মানিত। তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক, স্কলার, শিক্ষাবিদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯৯২ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার মরণোত্তর *ভারতরত্ন* সম্মানে ভূষিত করা হয়। তিনি তাঁর সারাজীবন শিক্ষাপ্রসারে ব্যয় করে গেছেন। তাই ১১ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনকে ভারতের জাতীয় শিক্ষাদিবস হিসাবে পালন করা হয়।

অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নিয়েও তাঁর দার্শনিক ধ্যানধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই উপলব্ধি যে সমস্ত ধর্মের অনুসারীদের জন্য এক ঈশ্বরের ধারণা এবং এক পরম প্রভুর উপাসনা করে মানবজাতির ঐক্য আনা যেতে পারে। ছোটবেলা থেকেই তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে উর্দু কবিতার বই পড়তে ভালোবাসতেন। তিনি ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের পূজারী ছিলেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩-১৪ বছর তখন তিনি স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের মুক্তচিন্তার ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ইসলামের তথাকথিত শিক্ষাব্যাবস্থা সম্পর্কে বিতৃষ্ণা পোষণ করতে শুরু করেন। তাঁর ১৪ থেকে ২২ বছর এই বয়সকালে তিনি একপ্রকার নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন

বা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে আধ্যাত্মিকভাবে গৃহহীন (spiritual homeless) হয়ে পড়েন।

পরবর্তীতে ১৯০৯ সাল নাগাদ তিনি ইসলামকে এক নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করলেন, ইসলামের প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হলেন। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে মুসলমান আর হিন্দুরা একত্রিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে পারলে তবেই স্বাধীনতা আসবে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এমন একটি অনুভূতি যা তিনি তার জীবনের প্রথম থেকেই লালন করে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এমন এক সময়ে তাঁর কর্মকাণ্ডে রুষ্ট হয়ে ব্রিটিশরা তাঁকে কলকাতা থেকে বন্দী করে রাঁচিতে নিয়ে আসে। প্রায় সাড়ে তিন বছর জেলের ঘানি টানতে হয় তাঁকে। জেলের মেয়াদ শেষ হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং গান্ধীর মতাদর্শের প্রতি তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। আজীবন তিনি এই মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে গেছেন। তিনিই সম্ভবত প্রথম গণ্যমান্য কোনও মুসলিম যিনি নিজেকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর চারিত্রিক বিশিষ্টতাকে ধরতে গেলে মনে রাখতে হবে তীব্র ঔপনিবেশিকতাবিরোধী মনোভাব তাঁকে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী ও মানবতাবাদকে একটি প্ল্যাটফর্মে এনে মেলাতে সহায়তা করেছিল। তিনি নিজে মুসলিম হয়েও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবাষ্পের মধ্যে দাঁড়িয়ে, শিরদাঁড়া উঁচু করে অখণ্ড ভারতের প্রতিভূ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি, এবং সেই বিরোধিতা ছিল ইসলাম ধর্মের ওপর তাঁর প্রবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান যদি হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান হতো, তাহলে আমি তাতে আমার সমর্থন জানাতাম। তিনি মনে করেছিলেন যে রাজনীতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগের ধুনো তুলে দেশভাগের পরে যে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরি হবে তার ভবিষ্যৎ হাজার বছরের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে অস্বীকার করে তৈরি হবে এবং তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক — কোনও দিক থেকেই স্থিতিশীল হবে না। তিনি মনে করতেন যে সাধারণ হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে যত না অবিশ্বাসের হেতু আছে তার বেশি অবিশ্বাসের হেতু আছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিবিদের মধ্যে।

তিনি ভারত ভাগ করা হলে তার ভূ-রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা নিয়ে অনেক চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইতিহাসের চাকা এখন আর ঘোরানো যাবে না। কিন্তু ওনার ভবিষ্যৎবাণীগুলোকে অনুধাবন করলে, বিশ্লেষণ করলে আমরা হয়তো অনেককিছু শিখতে পারব। ভারত ভাগের আগেই তিনি অনুমান করেছিলেন যে এতে ধর্মীয় সংঘাত বাড়বে বৈ কমবে না, এবং একই ধর্মীয় সংঘাতের কারণে পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বাড়বে। হাজার মাইল দূরত্বে থাকা পূর্ব অংশ একদিন না একদিন আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। তিনি এও অনুমান করেছিলেন যে পাকিস্তানে গণতন্ত্র সামরিক শাসক দ্বারা বিঘ্নিত হবে। দুঃখের কথা হলো যে হিন্দু মতামতের একটি অংশও এখন ভাবতে শুরু করেছে, এনডব্লিউএফপি, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ছেড়ে দিয়ে এবং অর্ধেক পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে অর্ধেক বাংলাকে মেনে নিয়ে, তারা ভারতের বাকি যে-অংশটুকু পাবে, তাও তো একটি বিশাল দেশ হবে। তাই সই। পাকিস্তান হয়ে গেলে মুসলমানদের কাছ থেকে আর কোনও সাম্প্রদায়িক দাবিদাওয়া থাকবে না।

তিনি দেশভাগের বিরোধী আর একটি কারণে ছিলেন। তিনি মনে করতেন, যে-বিষয়গুলি ভারতীয় সমাজে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং একটি শক্তিশালী অনুসারী তৈরি করেছিল, সেই মূল শক্তিই এখন দেশভাগের রাজনীতির শিকার হয়েছে। এতে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে তা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সকল সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ধর্মকে মাত্রা ছাড়িয়ে আঘাত করেছে। মুসলমানরা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা যদি কুরআন ও মহানবির জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত এবং ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি না করত তাহলে ইসলামের বিকাশ থেমে থাকত না। ধর্মের নামে আমরা যে রাজনৈতিক বিরোধ তৈরি করেছি তা ইসলামকে রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি হাতিয়ার হিসাবে প্রজেক্ট করেছে। ব্রিটিশ প্রভাবে আমরা ইসলামকে একটি সীমাবদ্ধ ব্যবস্থায় পরিণত করেছি, ভারতীয় মুসলমানরা ইসলাম ও এর বাণীকে হিমায়িত করেছে। আসলে এখন তারা সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করেছে, ইসলামি মূল্যবোধের কাছে নয়। তারা কুরআনের ধর্ম নয় রাজনীতির ধর্ম পছন্দ করে।

পাকিস্তান একটি রাজনৈতিক অবস্থান — আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও এটি আসলে ধর্মভিত্তিক বিভাজন নয়। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলাম কখন এবং কোথায় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বসতি স্থাপনের জন্য

ভূখণ্ডের বিভাজনের বিধান দিয়েছে। কুরআনে বা নবি (সা.)-এর হাদিসে কি এর কোনো অনুমোদন পাওয়া যায়? ইসলামের পণ্ডিতদের মধ্যে কে এই ভিত্তিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে ভাগ করেছেন? আমরা যদি এই বিভাজন নীতিগতভাবে মেনে নিই, তাহলে কীভাবে আমরা একটি সার্বজনীন ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের সমন্বয় ঘটাব? তাঁর কাছে এই বিভাজনের ধারণা ছিল পরস্পরবিরোধী। ধর্মের ভিত্তিতে ভূখণ্ডের বিভাজন মুসলিম লীগ কর্তৃক পরিকল্পিত একটি কন্ট্রাপশন। তারা এটাকে তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা হিসেবে অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু ইসলাম বা কুরআনে এর কোনো অনুমোদন নেই। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের লালিত লক্ষ্য কী? ইসলামের আলো ছড়ানো নাকি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য ধর্মীয় লাইন ধরে এলাকা ভাগ করা? তিনি দাবি করেছিলেন যে পাকিস্তানের দাবি মুসলমানদের কোনো উপকারে আসবে না। তিনি বিভাজনপন্থীদের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে আপনি ইসলামের নাম ব্যবহার করছেন এমন একটি কারণে যা ইসলামিক মানদণ্ডে ঠিক নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে আমি আশা করি না যে লোকেরা আমাকে অনুসরণ করবে, তবে আমার বিবেকের ডাকের বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লোকেরা সাধারণত হয় জবরদস্তির কাছে বা তাদের অভিজ্ঞতার পাঠের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে থাকেন। মুসলমানরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি শুনবে না যতক্ষণ না তারা বিভক্ত হবে এবং এর ফলাফল অনুভব করবে। আজ তারা সাদাকে কালো বলতে পারে, কিন্তু তারা পাকিস্তান ছাড়বে না। এই ঘৃণা ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ককে চিরকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে বন্ধুত্ব করা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করা সম্ভব হবে না যদি-না কিছু বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে। বিভাজনের রাজনীতিই চিরকাল দুই দেশের মধ্যে বাধা হিসেবে কাজ করবে।

যতদিন জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী বেঁচে থাকবেন ততদিন এই বিভাজনের প্রতি পূর্বপাকিস্তানের আস্থার ক্ষয় হবে না। কিন্তু এর পরে কোনো ছোট ঘটনা বিরক্তি ও অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। আমি মনে করি, পূর্বপাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিমপাকিস্তানের সাথে কোনো উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য থাকা সম্ভব হবে না। নিজেদের মুসলমান বলা ছাড়া দুই অঞ্চলের মধ্যে আদৌ কোনও মিল নেই। মুসলিম হওয়ার বিষয়টি পৃথিবীর কোথাও টেকসই রাজনৈতিক ঐক্য তৈরি করতে পারেনি। পূর্বপাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, যখনই তা ঘটবে, পশ্চিমপাকিস্তান আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। পাঞ্জাব,

সিন্ধু সীমান্ত এবং বেলুচিস্তানের উপজাতীয় পরিচয়ের দাবি বাইরের হস্তক্ষেপের দরজা খুলে দেবে। আন্তর্জাতিক শক্তি পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে বলকান ও আরব রাষ্ট্রের আদলে দেশকে ভেঙে ফেলার আগে এটা হবে না। হয়তো সেই পর্যায়ে আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করব, দ্বিজাতিতত্ত্ব সমর্থন করে আমরা কী পেয়েছি আর কী হারিয়েছি। আসল বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি, এটা অবশ্যই ধর্ম নয়। তারা তাদের ভয়কে আড়াল করার জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থন করে এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্র চায় যেখানে তারা সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার রাখে। কতদিন তারা এই প্রতারণাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেটাই দেখার বিষয়। এই মানুষটির নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক অবিসংবাদিত নেতা।

আজ এতদিন পরে মনে হয় — এই মানুষটি কী করে এত দূরদর্শী হতে পেরেছিলেন? আবার অন্যদিকে ভাবতে অবাক লাগে এ-রকম মানুষেরও তাহলে দূরদর্শিতার অভাব হয়! তিনি বোধহয় স্বপ্নেও এটা ভাবতে পারেননি যে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক দরবারে সমুন্নত করা বাঙালি জাতির একাংশ বাংলা ভাষাকে ভুলে, শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা শহিদ হয়েছিলেন, তাদের ভুলে গিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে একসময়ে আবার পাকিস্তানপন্থী ইসলামিক রিপাবলিক হবার জন্য মুখিয়ে উঠবে।

বিরুদ্ধ আলাপ বা সময়ের দাগ
অভীক সোবহান

জুলাই গণঅভ্যুত্থান : ৪ জুন হতে ৬ আগস্ট পর্যন্ত ফেইসবুক-পোস্টসমূহ

জুন ৪, ২০২৪

সর্বকালেই ছাত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রাষ্ট্র বা প্রশাসন যতই অরাজকতা রুখতে বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনীয় দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হিসাবে উপস্থাপন করুক না কেন পরবর্তীতে তা প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষুদ্রতর বা দলীয় স্বার্থেই তা করা হয়েছে, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৯৫২-তে বা মেক্সিকো সিটির ত্রেস কালচুরা প্লাজা, ১৯৬৮, চায়নার তিয়েনেনুমেন স্কয়ার, ১৯৮৯ বা আমেরিকার কলেজ স্ট্রাইক ভিয়েতনামযুদ্ধবিরোধী, ১৯৭০ বা ইরানের তাজরিস স্কয়ারে ২০২৩ জুড়ে নারী-অধিকারের যে আন্দোলন হতে চলমান গাজা সহিংসতার বিপরীতে বিশ্বব্যাপী ক্যাম্পাস আন্দোলন...এ-রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আজ তিয়েনেনুমেন স্কয়ার দিবসে রজার ওয়াটার্স (পিঙ্ক ফ্লয়েড) আমার অতি প্রিয় অ্যালবাম Amused to Death (১৯৯২)-এর Watching TV গানটি শেয়ার দিলাম : আমার হলুদ গোলাপ / তার রক্তমাখা সাদা পোশাক / যার মাথার সাদা বান্ডানায় লেখা ছিল মুক্তি আজই /...সে ছিল আমাদের ব্যর্থতার প্রতীক / কারণ সে-টিভিতেই তার মৃত্যু হয়েছে... ।

জুলাই ১৫, ২০২৪

(কোটা প্রসঙ্গে) মোটাদাগে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমি কোটাবিরোধী, দু একটা ইস্যু ছাড়া। তবে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা না থাকলে সবার জন্য মাঠ সমান হবে তা ঠিক। কিন্তু তাতেও খুব একটা কিছু হবে না। কেননা কোটা হতে আসা ও কোটাহীন অধিক পরিশ্রম-সংগ্রাম করে পাবলিক সার্ভিসে আসা সকলেই কি-রকম যেন লংকায় গিয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং আপাতভাবে কোনো বাবা-মা বা পরিবার স্বপ্নপূরণ হলেও আমজনতার কোনো

লাভ হয় না। ব্যবস্থাপনাতেই সমস্যা। সে-কথা বললে আমলাতন্ত্র আবার বলবে রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা (তা সরকারে যেই থাকুক)। সত্যি বলতে শুধু ক্যাডার সার্ভিস কেন, নন-ক্যাডার হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নানা চেহারায় এটি বিরাজমান...সুতরাং কী বলব! রাসেল বা সার্ত্রের ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের দায়ভার তো দূরের কথা সেই সপ্তদশ শতকে জন লক যে-কথা বলেছেন, যার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দাঁড়িয়ে, সেটা হলো — "সরকারব্যবস্থা একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার তথা জান, মাল ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে, বিনিময়ে আমরা কিছু কিছু স্বাধীনতা ত্যাগ করব। যদি তা ব্যর্থ হয়, তাহলে তার পরিবর্তনের অধিকার আমাদের থাকবে।"...এ কথাটাও আজো বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে বলা মুশকিল রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি বা তীর্যক নিপীড়ন তৎপরতার তো শেষ নেই। তাই বহু বছর ধরে সুইডিস পলিটিশিয়ান উল্ফ পামের একটা উক্তি বিকল্প হিসাবে বারবার বলি...বেশ বিমূর্ত সুন্দর, "Democracy is a question of human dignity. And human dignity is political freedom." যা হোক, সংঘর্ষ নয় আলাপের মাধ্যমে চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সমাধান আশা করছি।

জুলাই ১৬, ২০২৪
পিবিএস নিউজ থেকে জানলাম, চলমান কোটা আন্দোলনে ইতোমধ্যেই ৫ জনের মৃত্যুর সংবাদ! মিডিয়া/সোশ্যাল-মিডিয়ায় শুনছি এরা নাকি সাধারণ ছাত্র নয়, এরা বিএনপি-জামাতের সদস্য! প্রথমত, এ-কথাটির মাধ্যমে মৃত্যু জায়েজ হয় না তা সাধারণ আর অসাধারণ যে-শিক্ষার্থীই হোক। এর দায় ব্যক্তির নয়, কখনো কখনো পলিটিক্যাল পার্টির, তবে সবসময়ই রাষ্ট্রের। দ্বিতীয়ত, আমি আমার দলকানা ফেইসবুকবন্ধুদের কাছে জানতে চাই সবসময়ই — তা আজকের এই ২০২৪-এর কোটাবিরোধী আন্দোলন হোক অথবা ২০১৩-র যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের বা আমজনতার যে-কোনো ন্যায্য আন্দোলনে বিএনপি সরকার বা আওয়ামী সরকার...ক্ষমতায় যে-ই থাকুক তার বিরোধী ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল অথবা যে-কোনো পলিটিক্যাল পার্টি চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলে বা যোগ দিলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলন ইনভ্যালিড হয়ে যায়? কখনোই নয়। আর কোনো অবস্থাতেই আলোচনা বাদ দিয়ে দমন-নিপীড়ন... বিশেষত হত্যা কি গণতান্ত্রিক/সমাজতান্ত্রিক/রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনোকালেই গ্রহণযোগ্য হয়নি, ইতিহাস তা-ই বলে। আর-একটি বিষয়,

আমার ধারণা কোটা আন্দোলনে প্রকাশিত ক্ষোভ শুধু কোটা নয়, এর সাথে আমলার ছাগল, আমলার ড্রাইভার...বাহিনীপ্রধানদের বড় গলা...এই রকম রাষ্ট্রের সকল পক্ষ হতে ভেরিফাইড সংবাদগুলিও আছে।

জুলাই ১৮, ২০২৪

কোটা আন্দোলন কি কোটা আন্দোলন? মোবাইল-ইন্টারনেট বন্ধ কি এর সমাধান? কোটা আন্দোলন প্রথমে কোটা আন্দোলন থাকলেও, এখন আর এটা কোটা আন্দোলন নেই, এটা কমবেশি সবাই বুঝতে পারছেন। সুতরাং সরকারে থাকা আ.লীগ ও বিরোধী বিএনপি-ও তা জানে। বিএনপি এ হতে কিছু সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করবে যা রাজনীতিতে স্বাভাবিক। একই সাথে প্রায় কোণঠাসা স্বাধীনতাবিরোধী চক্র হালে পানি পাওয়ার চেষ্টা করবে। সুতরাং বর্তমান সরকারদলীয়রা এই ন্যারেটিভ তৈরি করছে এসব মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের কারসাজি অথবা বিরোধী বিএনপির অপতৎপরতা। কিন্তু সমস্যা হলো সরকার নিজেও জানে বিএনপি সাংগঠনিক অক্ষমতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাদের এমন দেশব্যাপী সর্বাত্মক আন্দোলন তো দূরের কথা কোনো-একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও কিছু করার ক্ষমতা নেই, তা আরো বেশ ক'বছর আগে হতেই ছাত্রলীগের দায়িত্বে বা দখলে। এ অবস্থায় কোটা আন্দোলনটি আসলে যে "নাগরিক অসন্তোষ/Civil Discontent" ক্রমে গণঅস্থিরতায়/Civil Unrest-এ 'অংশত' পরিণত হয়েছে সেটা স্বয়ং দেশপ্রধানও বোঝেন বলেই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী 'নাগরিক অসন্তোষ' যেহেতু (সাধারণত) যে-কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অসমতা, রাজনৈতিক দুর্নীতি, সামাজিক অবিচার, বিচার-বৈষম্য এবং সর্বোপরি সমান সুযোগের অভাব (এ ক্ষেত্রে কোটা)...এসব কারণেই হয়, তাই সরকারি দলের ও সমাজের সুবিধাভোগী একাংশ এই আন্দোলনকে নব্য রাজাকার তথা বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অজুহাতে দমন-পীড়নের পথই বেছে নিয়েছে। দলকানা আমার বন্ধু, পরিচিত লেখক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকর্মীদের অনেকে এটাকে সঠিক মনে করছেন স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তির উত্থানের ভয়ে। তাদের আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে ২০০৮-এ আওয়ামী সরকার আসার আগে স্বাধীনতাবিরোধীদের বিপরীতে কথা বলে আমরা যারা বিব্রত ও তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের চাপের মুখে পড়েছি, তখনও আপনাদের পাশে পাইনি আবার এমনকি ভুলে না গেলে মনে করিয়ে দিতে চাই ২০১৩ সারাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জাগ্রত প্রজন্ম চত্বরে উপস্থিত

শিক্ষার্থী-শিক্ষক-আপামর সাধারণ মানুষ 'প্রথম দু-একদিন' আপনাদের, এমনকি ছাত্রলীগের কর্মীদের পাশে দেখেনি।

তখনও বিষয়টি ছিল বিচার বিভাগের রায়ের বিপরীতে গণঅনাস্থা, যেমন এখন সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের অপেক্ষা শিক্ষার্থীরা করেনি। বিচার বিভাগের প্রতিও মানুষের অনাস্থা কেন তা আলাপ করতে গেলে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার নানা দিক আলাপ করতে হবে আর তার মাঝে সব থেকে বড় দিক Surveillance/নিরীক্ষণ, যেটা যে-কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সতর্কতাও বটে। তবে বাংলাদেশে আইসিটি অ্যাক্ট আইন প্রণয়নের পর থেকে যা চলছে তা টোটালিটেরিয়ান ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। ইদানীংকালে এটা Intensive Mass Surveillance বা গণতদারকিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে এটা আইন প্রণয়ন ও সরাসরি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েই করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এই তদারকি ব্যবস্থাটির কারণে মানুষ তার বাকস্বাধীনতা হারিয়েছে, মূলত ভয়ে। কেননা চল্লিশের দশকে প্রকাশিত জর্জ অরওয়েলের সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস '১৯৮৪'-এ 'Thought Police' ও 'Big Brother Watching You' বিষয়গুলি এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনের ভেতরের 'ক্ষোভ/অসন্তোষ' তা দল-মত নির্বিশেষে রয়েছে। ইন্টারনেট-মোবাইল নেটোয়ার্ক বন্ধ করলে বিষয়টি মন হতে হারিয়ে যায় না।

ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী পেশাগত জীবনে গিয়ে হয়ত আর আপোসহীন থাকে না, অনেকেই সিস্টেমের সাথে সমঝোতা করে বা লোভে বশীভূত হয়ে নিজেও অন্যায় করে। কিন্তু শিক্ষাজীবনে, বিশেষ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাধারণ' শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক মতাদর্শ বা মতামত থাকলেও মূলত তারা শ্রেণিহীন ও ন্যায়ের ও ন্যায্যতার পক্ষেই থাকে; অন্তত আমি বাংলাদেশের প্রায় একাধিক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি ও পড়িয়েছি, সে-অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। যা হোক, নিজের বয়স যত বাড়ছে তত অনুভব করি এই সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়ারা কত অল্প বয়সের ও নিষ্পাপ...এমনকি পার্টিপলিটিক্স-উন্মত্ত ছেলেগুলিকেই শিক্ষকতাকালে কাছ থেকে দেখেছি, নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থে বড়রা উসকিয়ে না দিলে ওরাও আর-দশটা মেধাবী মুখ।

কোটাবিরোধী আন্দোলন তথা অধিকার আদায়ের জন্য এই সকল তরুণ প্রাণ যখন পুলিশের গুলিতে নিহত হয় তখন মেনে নেওয়া মুশকিল এবং রাষ্ট্রকে

এর দায়ভার নিতে হয়। যে-কোনো সংকটে আলোচনার বিকল্প নেই। আফসোস এবারের পরিস্থিতিতে আলাপ-আলোচনার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ল না। সরকারের কাছে অনুরোধ, আমরা আর শিক্ষার্থীদের রক্ত দেখতে চাই না, এখনো সময় আছে আলোচনায় বসার এবং এ-উদ্যোগ ক্ষমতায় যারা থাকেন তাকেই নিতে হয়। জীবন দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই তাই দয়া করে লাশের মিছিল আর বড় করবেন না।

জুলাই ৩৩, ২০২৪

বইপড়া মানে গ্রন্থশ্রবণ : 'সন্ধ্যায় অদ্ভূত ঘটনা ঘটল : সম্ভবত বিশটি পরিবার একটি পরিবারে পরিণত হলো, সব শিশুরা ভাই-বোন, সব বাবা-মা মিলে একক অভিভাবক। তাদের ভিটা হারানোর ক্ষতি ও যাত্রাপথের ক্ষুধা-ব্যাথা যেন একক বেদনায় পরিণত হলো।' — জন স্টেইনবেক, উপন্যাস 'ক্রোধের আঙুর' (১৯৩৯) থেকে। এর কোনো অন্তর্নিহিত মানে নেই, বহু বছরের বিরতিতে বইটা দ্বিতীয়বারের মতো পড়ছি...নিছক খেয়ালে অনাক্ষরিক অনুবাদ।

জুলাই ৩৬, ২০২৪

সাধারণ ছাত্র-জনতার অসাধারণ গণঅভ্যুত্থানের পর সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসা ও অতীতে ক্ষমতাভোগী লোভী সকল দলের পচে যাওয়া রাজনীতিবিদদের থেকে বাঁচতে — একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন, শক্তিশালী বিচারপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের উপস্থিতি দেখতে চাই...টিভিতে যতটুকু দেখলাম অন্তত প্রথম আলাপের দিন ফ্যাসিস্ট আ.লীগ সরকারকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ রাজনৈতিক দলের নেতা ও দলীয় বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতি...সুতরাং সতর্ক থাকুন সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে আলোচনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আওয়াজ তুলুন।

জুলাই ৩৭, ২০২৪

ক্ষোভ নাকি লোভ ও হিংসার আগুনে জ্বলছে স্বদেশ? অত্যন্ত ব্যথিত ও শঙ্কিত হৃদয়ে এই বিশ্লেষণটি করার চেষ্টা করছি, যদিও লেখার মতো মনের অবস্থা নেই।

১. ক্ষোভ — রাজনৈতিক বিদ্রোহের পর সরকার পতনের পর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রায়ই কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতীক হিসাবে দেখা যায়, যেমনটা মার্ক্স বা গ্রামশি বলেছেন। যা ৫ তারিখে বঙ্গভবন সহ বেশকিছু থানা

পোড়ানো ও লুটপাটের মাঝে লক্ষণীয়। বিশেষ করে নানা মত-পথের মানুষ যখন একটি জেনারেল ইস্যুতে একত্রিত হন, তখন মবসাইকোলজি যা হওয়ার তা-ই হয়।

২. লোভ — একটি সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত ও লুম্পেন প্রান্তিক মানুষ লোভের বশেই ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, এটা কমিউনিস্ট বা ধর্মীয় শাসনব্যবস্থার সম্পদের পুনর্বণ্টন নয়। বঙ্গভবন থেকে পায়রা/কবুতর ছিনিয়ে এনেছে যে, তা আপাত শান্তির পায়রা পুনরুদ্ধারের প্রতীক মনে হলেও চুরিকৃত পাখিটিকে জবেহর মাধ্যমে গলাধঃকরণের সম্ভাবনাই এর উদ্দেশ্য। সেই সাথে সমাজের ক্ষমতাবান বাহুশক্তির বলে বলীয়ান আজীবন শোষণকারীরা লুট করছে জায়গা-জমিন বা দখল হওয়া প্রতিষ্ঠানের পুনর্দখল। কবুতরের তুলনায় এসব আরো পরিকল্পিত অপরাধ, যা এ-সময় সহজেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

৩. প্রতিহিংসা — রাজনৈতিক প্রতিশোধে হোটেল/মিল/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ছে! হাসিনা সরকার যখন ক্ষমতায় এসেই জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম বদল করল, যা তিনি তার ৯৬ টার্মেও করেননি, এবং এক্ষেত্রে তার পিতার নামও নয়, কায়দা করে ধর্মীয় ইমেজ হিসেবে শাহজালালের নাম ব্যবহার করল, যাতে বিএনপি এলেও বদলাতে না পারে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সকল অর্জনকে একচ্ছত্র তার পরিবারের অধিকারবলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের শিক্ষায় ভুলে যাওয়া যে-কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়, শুধু প্রকৃত সত্য ছাড়া। তারই ফলাফল আজ আগুনে পুড়ছে ধানমন্ডি ৩২।

৪. ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভীষণ মনখারাপ। আপনি যদি সুস্থ মানুষ হন, বিকারগ্রস্ত না হন, তবে সারাদেশব্যাপী এই লুটপাট-হত্যা আপনাকে ঢাকা থেকে লন্ডন, নিউইয়র্ক পর্যন্ত...পথঘাটে মিষ্টি ও জিলেপি বিতরণ এবং গলাধঃকরণ করতে বাধা দেবে। এই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি তবে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, বরং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা এখনও যেমন বলছেন 'যেতে হবে বহুদূর', সেটা সত্য। মানুষের মৃত্যু, ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রতিশোধের আগুনে আপনি মসনদে যাবার তথাকথিত অংশীদার পথ স্ট্যাবলিশ করতে চাচ্ছেন সেটা আমাদের অনেকেরই জানা। আর মনে রাখবেন, বিএনপির যে রাজনৈতিক ধারা তারেক জিয়া প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে ২০০১-পরবর্তী সময়ে, সে-কাঠামোটিতেই সফল হয়েছে হাসিনা সরকার — যেমন পুলিশশাসিত রাষ্ট্র, ধর্মীয় চেতনার উন্মাদনার বদলে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উগ্রজাতীয়তাবাদ, বিএনপি সরকারের নিপীড়নমূলক খসড়া আইসিটি আইন ২০০৬-কে ২০১৩ সালে আ.লীগের পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত করা, অপারেশন ক্লিন হার্ট, র‍্যাবের ক্রসফায়ার বদলে এনকাউন্টারের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। মাঝে মাঝে ভাবি, সুযোগ পেলে আমরা বঙ্গসন্তানরা সবাই কি লুণ্ঠনকারী হয়ে উঠছি? ভুলে যাই ন্যায় ও ধর্মজ্ঞান...শুধু প্রাপ্তি — তা যেভাবেই হোক! সামান্য ক্ষমতার বলেই পরিবারে কিংবা প্রতিষ্ঠানে আমরা বাঙালিরা যথেষ্ট একনায়ক!

রোডসাইড টিস্টলের আড্ডাটা আজ আর নাই

জাহেদ আহমদ

একই সে-বাগানে আজ এসেছে নতুন কুঁড়ি
শুধু সেই সেদিনের মালি নেই

কিংবা আছে, চেইঞ্জ হয়েছে কেবল আড্ডার পয়েন্ট অফ টাইম, চেইঞ্জ হয়েছে আড্ডার ডিউরেশন শুধু। পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম যেহেতু, বিনাশ নয়, পুরোপুরি বিনাশ নাই জীবনের কোনোকিচ্ছুটিরই। ভিন্ন সুরতে সেই আড্ডাটাই তো রয়ে গেছে আজও। মধু ও মদের সেই কিশোরকালোত্তীর্ণ যৌবনবাউলিয়ানা। আড্ডার মুখগুলো বদলে গেছে, এবং বদলেছে আড্ডার আঙ্গিক ও আদলও হয়তো। তবু আড্ডা তো অনিঃশেষিত। ফুরায়ে যেয়ে আবার ভরাতে আসে জীবন নব নব।

কফিহাউসের সেই আড্ডাটা আমাদেরও অস্তমিত অনেককাল হলো, সকলেরই নিয়তি ইহা, আড্ডা ভেঙে যায় কিন্তু তার সুর তো অটুট। ফলে এই গান, এই একটিমাত্র গানেই, প্রতিটি বাংলাভাষাভাষী মানুষের প্রাণের চলচ্চিত্র। কফিহাউসেই বিশেষ একটা হার্টবিট—আমার, তোমার, আমাদের সবার; যে-বন্ধুটি কোনোদিন সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকেনি বারো-ইয়ারি দুস্তিয়ানায়, এমনকি তারও। ফলে সেই আড্ডাগানের শিল্পী মান্না দে এক-অর্থে যেমন চলে গেলেন, আবার ঠিক চলে গেলেনও না, বিদায়ের ভিতর দিয়া মান্না দে অন্যপ্রকারে হলেন বরং চিরস্বাগত!

আমরা যারা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের জন্মপূর্ব সময়ে জন্মেছি এবং আড্ডায় বেড়ে উঠেছি, আড্ডায় আড্ডায় জুড়িয়ে দিয়েছি জীবন ও জাগতিক যাবতীয় সফলতা-নিষ্ফলতা, তাদের ছলছল গুনগুনানির ভিতর অমর এই কফিখানার মালিক মান্না। কাফেটেরিয়ামার্চেন্ট মান্না দে। এ পৃথিবী একবার পেয়েছিল তারে চিরকালের লাগিয়া। আর মান্না দে আমাদের জীবনে সেই বিরলজন্মা

মানুষ, যিনি আমার বাপের বন্ধু, আমার বন্ধু, আমার মেয়েরও বন্ধু। চুরটফোঁকা ভাবভালোবাসার বন্ধু, একই কাপ তিনজনে ভাগ করে খাওয়া চায়ের ইয়ার মান্না দে।

যদিও আক্ষরিক অর্থে আমার জীবনে তো কফিহাউস নয়, ছিল অন্য ডেরা, আড্ডার একাধিক চিপাচাপা ছাপড়া চাদোকান ছিল আমাদের। ছিল টিলাগড় কলেজগেটের মামার দোকান, ছিল প্যারিস ম্যানশনের রতনের দোকান, ছিল বইপত্রদোকানের বারান্দালাগোয়া চায়ের ছাউনি। ছিল চৌহাট্টার মোড়ের ছাপড়া। আর ছিল আমাদের ছোট্ট শহরের রাজকীয়তা—পাঞ্জেরী রেস্টোরান্টের দুধডোবা চায়ের ঘণ্টার পর ঘণ্টার বিকাল-সন্ধ্যাগুলো। সমস্ত রাস্তাপাশের ঝাপতোলা-ঝাপফেলা চায়ের ছাপড়াগুলো মিলে একত্রে আমাদের কফিহাউস।

যখন থেকেই গানটা আমরা শুনেছি, কোনোদিনই ঘুণাক্ষরেও কলকাতার কোনো ব্র্যান্ড আঁতেল কফিখানার কথা মাথায় আসে নাই। আমাদের মাথায় চিরদিনই *কফিহাউস* বলতে সেই সম্মিলিত ছাপড়াগুলো। *কফিহাউস* আমাদের ক্যালাইডোস্কোপ, আমাদের স্যানাটোরিয়াম। যতগুলো চরিত্র *কফিহাউস* ছোটগল্পে এসেছে, সেগুলোর একটা আমি—কিন্তু কোনটা, তা আমি নিজের মুখে বলব না, তা জানে আমার বিচ্ছু বন্ধুরা। বাকি চরিত্রগুলো ধরে ধরে আমি নিজে একটা ভার্শন তৈরি করতে পারি *কফিহাউস* গল্পের, সেই গল্পের শিরোনাম দিতে পারি : কফিহাউস রিভিজিটেড!

গল্পটা আমাদের কাছে হ্যান্ডোভার করে বেশ-অনেক বছর হলো অগস্ত্যভ্রমণে গেছেন মান্না। তার দিয়া-যাওয়া ফর্ম্যাটে প্রত্যেকেই নিজের বলয়ের গল্পটা আলবৎ বলে যেতে পারে। এতটাই ইম্প্যাক্ট আপনার আমাদের জীবনে, ডিয়ার মান্না দে, মিথ্যে বলছি না, আপনার অঞ্চলের ভাষায় *মাইরি বলচি*! কিন্তু ভুলে যেতে পারি আমরা আপনাকে, যেতেই পারি ভুলে হে গানবন্ধু, অতি অনায়াসে যেতে পারি ভুলে, এবং ভুলিয়া যাওয়াই তো মনুষ্যস্বভাব। ভুলিয়া থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমরা তো সমস্ত দুনিয়া চাওয়াচাওয়ির পর এই একটা চাওয়ার কাছে প্রণিপাত করি অবশেষে। বেঁচে থাকবার এক অতিকায় ইচ্ছে। বেঁচে থাকার কাঙালপনা আমরা রাখি প্রকাশ্যে। এত মনে রাখলে তো চলে না তাই। কিন্তু *কফিহাউস* ভুলে যাওয়া! না, নেভার, নৈব চ।

সব ভুলে যাই, মৃত্যুশোক ও প্রেমিকার সদ্যদত্ত দাগা, মাতৃমৃত্যু ও পিতৃবিদায়, কিন্তু নিজের শৈশব ও তরুণদিনের মন্ত্রতুল্য সময়ট্র্যাক ভুলে যেতে পারি?

নিতান্ত অসুখ করে তো, মস্তিষ্কবৈকল্য ঘটে তো, অন্য কথা। আর বন্ধুদের ভুলে যাওয়া মানে তো নিজেকেই ভুলে যাওয়া। আর নিজেকে ভুলে যাওয়া মানে মৃত্যু ছাড়া আর কী! ইনডিড, *কফিহাউস* আপনি গেয়েছেন গান হিসেবে, আর আমরা এটাকে নিয়েছি আমাদের মন্ত্র হিশেবে। এই মন্ত্র নিয়েই আমরা বিচ্ছেদ মেনে সেঁধিয়ে গেছি যার যার খোঁয়াড়ে। এবং এরপর থেকে প্রতিটি দিন, প্রতিটি বিদঘুটে একাকিত্বের ফোকরে, জীবিকাশাসিত জন্তুর এই জীবনে, এই সকরুণ রোদনের রণরৌদ্রময় নিষ্ঠুর নির্বান্ধব উঠোনে, এই *কফিহাউস* আমাদের বাহুতে-গলায়-মণিবন্ধে রেখেছি বেঁধে কবচের ন্যায়।

এ-গান রক্ষা করে চলেছে এক-দুই-তিন নয়, একুশ-বাইশ-তেইশ বছর ধরে আমাকে এবং আমি জানি আমার দূরদীর্ণ বন্ধুগুলোকেও। কদাচ কখনো ফুঁপিয়ে উঠি, দীর্ণ ধুলোমূর্ছিত পতনধসের শব্দ শুনতে শুনতে, পরক্ষণে ফের নতুন ধানের ন্যায় নির্মল ঝলমলে সোনালি হয়ে উঠি দৃশ্যগুলি দেখে, মুখগুলি দেখে দেখে। সেই মুখগুলো, দুর্দান্ত ধ্বনিচিত্র-ছায়াছবিগুলো সেদিনের, সম্বল বলতে এ-ই তো একান্ত আমার। আত্মপরিচয়, নিজস্ব সংবাদ, রেজিয়্যুম প্রকৃত এ-ই।

এ কোনো অবিচ্যুয়ারি নয়, এ নয় বিচ্ছেদগীতিকা, বা এ নয় ইংরেজিতে যেটা জানি ট্রিবিউট/হোমেইজ বলে। একশ বছরে এইবার পা রাখলেন মান্না দে। এ নয় হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সেলেব্রেশন। এ নিজেকেই মনে করা আরেকবার, রোজকার মতো, নিজের নিঃশ্বাস করতলে টের পাবার ব্যাপার। এ হলো রক্তগ্রন্থির কাছে গোপনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার। এটা কোনোভাবেই মৃত্যুপরবর্তী বিদায়চিঠি নয়, শেষ পুষ্পস্তবক নয় কফিনের পিঠে, এ নয় বার্থডে সেলেব্রেইটিং ধামাকা। আদতে এ এক স্বীকৃতি, তৃণপুষ্পের ন্যায় তিফিল, নিজেরই জীবনের। আমার বন্ধুদের জীবনের। স্বীকৃতি এই মর্মে যে, ব্যর্থ, হয়তো বৈষয়িক ও অন্য বহুবিধ বিবেচনায় ব্যর্থই আমরা, তবু ব্যর্থ নই পুরোপুরি, ব্যর্থ হয়নি জীবন আমাদের। কফিহাউসের মতো অনুপম গানাভিজ্ঞতা আছে যেহেতু, অনেক অনটনের ভিড়ে এটুকু সহায়, কাজেই, ব্যর্থ নই তো!

অনেককিছু করে-দেখে-খেয়ে-শেখে-এঁকে-বেঁকে-নেচে-বেচে শেষে এসে এইখানে এই ইঁদারার ধারে দাঁড়াই, উবু হয়ে থাকি অনেকক্ষণ, ধ্বনি করে উঠি জোরে প্রতিধ্বনির আশায়। এ-ই তো, *কফিহাউস*, বন্ধুদের নাম ধরে ডাকছি আবার। ওই তো, ডোমচাড়ালের নাচের সঙ্গে একডজন ব্যান্ডগান,

গুটিকয় ইংরেজি আর যখনতখন দমকাবাতাস পল্লিগীতি, সবশেষে *কফিহাউস*। *কফিহাউস* দিয়ে ব্রহ্মদত্যি টিলার ওপর মনোজ্ঞ অ্যামেচার অনুষ্ঠান সমাপ্তি। তিরিশদিনই, প্রায়। ভেন্যু বদলাত, অনুষ্ঠানের ফর্ম্যাটও, শুধু *কফিহাউস* বদলাত না। *কফিহাউস* কখনো সলো হয়নি, নিয়ম ছিল না কি-না জানি না তবে সম্ভব ছিল না, *কফিহাউস* সলো গাওয়া আজও সম্ভব নয়। বৃন্দগানেও যার গলা মাটির মতো মরমে মিইয়ে যায় সে-ও কফিহাউসে হেঁড়ে বীর!

আমরা ছেড়ে গিয়েছি একে অন্যেরে, *কফিহাউস* ছেড়ে যায়নি আমাদেরে কোনোদিন। একই *কফিহাউস* প্রত্যেকের সঙ্গে! তাজ্জব! জীবনেরই মতো, অবাক ম্যাজিক, অফুরন্ত। ফলে এইটা আমাদের নয়, এক অনিঃশেষ কফিহাউসের জীবনী। বায়োগ্র্যাফি অফ অ্যা সিরিজ অফ স্ট্রিটসাইড টিস্টলের মুহুর্মুহু মুখরিত আড্ডাবাজি। নিবন্ধটা আর কিছু নয়, ট্রিবিউট টু *কফিহাউস*, ইন ফ্যাক্ট। ফলে, নেভার অ্যাডিয়্যু, এভার ওয়েল্কাম, মান্না দে! এভার্গ্রিন *কফিহাউস*! এভার্গ্রিন বুড়ো-হতে-শুরু-করা বন্ধুরা আমার!...

প্রবোধ চন্দ্র দে, স্টেজনাম মান্না দে, জন্ম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, জন্মশতবর্ষ স্মরণ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আলফ্রেড আমিন

অবিকল মানুষের মতো

নির্জন মাঠে একা আমি এক হিজলের গাছ

কিন্তু তুমি কে? বললো সে। আমি দেখি আমার শরীর
মাটিতে গিয়েছে ঢেকে, কোমর অবধি, দুই হাত
ছড়িয়ে আছে দুইদিকে, দশটি আঙুল—অসংখ্য পাতাভরা ডালে

মনে হলো, বৃক্ষ নই, মানুষও তো নই
অবিকল মানুষের মতো

গান

কোথায় যেন লিখছি তোমার নাম
মরুবরফ একটি কথার মালা
নড়ছে বনে পাখির ঘন রাগ
জোনাকপুঞ্জ ভেঙেছে সব তালা

কোথায় যেন আঁকছি তোমার মুখ
শতক শতক শতক যাচ্ছে চলে
স্বপ্নজাহাজ না-ভাসা বন্দরে
রক্ত ভেসে যাচ্ছে গঙ্গাজলে।

সূর্যাস্তের মেঘ

জগৎসন্ধ্যার ঢেউ ভেসে আসবার আগে
আমাদের দেখা হলো দেড়কুড়ি বছরের পরে

যখন, তোমার দৃশ্য, স্মৃতি-সচল রক্ত থেকে সংবেদনে
মিশে যাচ্ছে সমুদ্রের গানে—
বাতাসের, ডানার মতো ঘনগন্ধে, রৌদ্রের ফুলে

আমাদের কথা হলো অন্তস্থ পৃথিবী বিষয়ে
ভারাতুর কান্না নিয়ে আমাদের হাসি একটানা ঝরে গেল
হেমন্তপাতার মতো মাটি-অভিমুখে,
মহাসাগরের মহানীরবতা কতদিন আমাদের মনে?
দুই মহাদেশব্যাপী তীব্রতর অশোকের বনে

আমরা ছুঁয়েছি হাত, সন্তানের নিষ্কলঙ্ক মুখ।

গুহাচিত্র

সমস্ত শোভন কার? আমি জানি। যদি হাত ধরো
তোমাকে সে নিয়ে যাবে অজন্তার গুহার ভেতর

সমাধিপ্রস্তরে নাম? কার নাম? কি লিখো ওখানে
হাতের আঙুল, গান, কণ্ঠধ্বনি ধরবে প্রস্তর

বেদনা আমার মা। আমি সেই চুর্ণ মুহূর্তগুলি
জামার আস্তিনে বেঁধে ঘুমরাত্রি পাহারা দিয়েছি

সূর্যালোকে শাদা রাজহাঁস

পাতালপ্রস্তুতি জেনে মেঘ গেছে দূর বনবাসে
কার হাতে তুলে দেবো আমি এই বিষজ্বালাভার
নিহিত জলের ছায়া জেগে আছে যে মাছের শ্বাসে
আকাশ জানুক তার আলোটুকু হয়েছে আঁধার।
তুমি কোন দূর দেশ, গন্ধময়ী বাতাসে বাতাসে
তোমার শরীর থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের ঘ্রাণ
নূপুরের শব্দে ঝরে জলতারা আকাশে আকাশে
ঝিনুকের দেহ ফেটে বের হয় রৌদ্রের প্রাণ

যে-গান বসন্ত আনে, দূরাগতা, বিদীর্ণ বাঁশিতে
অবরুদ্ধ বনভূমি, শস্যক্ষেত, প্রান্তরের ঘাসে
সেই গান আনো তুমি, অপরূপ জলরাশিতে
ভরে দাও ধূধূ মাঠ সূর্যালোকে, শাদা রাজহাঁসে।

আমার সমস্ত ধ্যান

বাঁ-দিকে ঘুরালে মুখ পাখিদের গান শুনতে পাই
ডানদিকে তুমি হাঁটো, ঘুঙুরের শব্দ ঝরে পড়ে
এখন কি দিন বলো রাত্রি বলো, কোনদিকে যাই
আমার সমস্ত ধ্যান ধবল জ্যোৎস্নার মতো ঝরে।
কে যেন নিঃশব্দে ডাকে, ভাবি তুমি, তবু বনবোধে
আমার অপেক্ষা, ভ্রম, উড়ে যায় দিগন্তে দোরে
যেখানে পাথরকাল, পর্বতেরা গলে যায় রোদে
মেরুদ্রাঘিমার রেখা দূরাগত আগুনের ভোরে।

তুমি তা বোঝো না শুধু কী এক আনন্দ সারাদিন
ধনুকের মতো নদী, বাঁকা নদী, কার গান গায়
ভেতরে বিষের পলি, ভেতরে করুণ ভায়োলিন
বাতাসে পালক ঝরে, পালকে বাতাস ঝরে যায়।

গোলাপ

মাটিতে তোমার ঘ্রাণ, একবার এসেছিলে তুমি
মরুধূসরের বুকে ফুটেছিলে—প্রথম গোলাপ
জীবনগভীর গানে, খরতাপে তৃষিত ও-ভূমি
হঠাৎ অন্ধচোখে পেয়েছিল কামরাঙা ভোর,
অযুত শতাব্দী শেষে পৃথিবীর—ক্লান্ত পৃথিবীর
দেখা পেয়েছিল কোনো যুবকের দল

শরীরে তোমার ঘ্রাণ, আজও আমি, হে গোলাপ
পৃথিবীর ধূলিপথে একান্ত তোমার অনুগামী।

রক্তনর্তকী দোলে, দুলে ওঠে পাতালভূমি

জানলা খুলিনি ভয়ে, যেন কেউ ডাক দিয়েছিল
অর্ধসত্য নাম ধরে, ঈশ্বর আমি তো বুঝিনি

তিনশ বছর শেষে ভোরগুলি, বালিরঙা গোধূলির গান
স্মৃতি হতে বের হয়ে, অন্ধচোখে আলো ফেলে গেলে
আমি দেখি সেই মুখ, হাসিটুকু, নিঃসঙ্গ চোয়াল

একাকী দাঁড়িয়ে আছে শব্দহীন গভীর সংগীতে

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়, হে সূর্য আমার কী দায়?
মৃতের শরীর থেকে কী করে হে প্রেম তুলে আনো
অখণ্ড রাত্তির থেকে ডেকে আনো প্রভাতকুসুম?

স্মৃতিগ্রহণের বাঁশি কে বাজাও, কে বাজাও তুমি
রক্তনর্তকী দোলে, দুলে ওঠে পাতালভূমি।

অস্তাচলের মুখ

চিনিবরফের হিমে মুখ রেখে দুইটি বালিকা
যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে
দুই হাত দূরে
ক'জন উন্মাদ
মাটি খুঁড়ে বের করছে ছায়া

একদা হয়তো সে কোনো-এক মুখ হতে, দেহ হতে
সূর্য হতে গড়েছিল নিজের শরীর,
তারপর ভেঙে গেলে হরিৎ সে-ঘুম
নিজের ছায়ার কাছে চেয়েছিল
ব্যথাঘন নিহিত বিনাশ

বালিকারা, মনে মনে চিনেছো পিতাকে?

মাটি খুঁড়ে বের হলো যে-ছায়া   তার মুখ গত সন্ধ্যার
মাটি খুঁড়ে বের হলো যে-ছায়া   তার মুখ আগত সন্ধ্যার।

বাবা

রক্তকে আশ্চর্য করে উদ্ভিদের সঙ্গী হলে, বাবা।

মানুষজীবন নিয়ে আমি ভাবি, আমার কী হবে?
উদ্ভিদ-সনেটগুচ্ছ, সন্ধ্যার সুতীব্র মালতি
কে নেবে কণ্ঠহারে, বিপুল বিশ্বাসে
আত্মঘাতী স্বপ্নপাঠে সন্ততির নিষ্কলঙ্ক মুখ?

ফুল ও পাখির সঙ্গে কথা বলি, ঘন অন্ধকারে

হরিতকী হিজলেরা গান গায়, হে সূর্য, হে য়ুসুফ
জীবনঘনিষ্ঠতা কে তোমাকে শিখিয়েছে বাবা?
রক্তপ্লাবিত ভূমে সবুজের স্বাধীনতা চাও?

নতমুখে কেঁদে উঠি আমি, লজ্জা পাই, ভয় পেয়ে যাই

জীর্ণ বিষাদরেখা মুছে যায়, স্বপ্নভার নূতন আকাশে
অক্ষমতা নিয়ে দেখি পৃষ্ঠদেশ মাটিতে ডুবিয়ে—
বাবা তুমি নিমগাছ, সুনির্মল বাতাসে দুলছো
কিঞ্চিৎ তোমার ছায়া ঢেকে আছে সামান্য আকাশ

সুজাতা, বুদ্ধের চিঠি

বিশুদ্ধ প্রেক্ষিতে যাও তুমি, আমি আরো না-দেখা ভূমিতে
পাখিদের মতো ফেলে নিজের ছায়ার ঝরাপাতা
বনদোসরের কাছে, শালবনে—ব্যাপ্ত সংগীতে
রৌদ্রগন্ধ ভ্রম নিয়ে বিধুর প্রান্তরে উড়ে যাই
হরিণের স্মৃতি শিখি। মানুষের হাত রেখে ঘাসের শরীরে
অস্তিত্ব আড়াল করে শুনতে পাই পল্লবের গান—
প্রতিচ্ছায়া খুলে ফেলে সব তরু সমবেত স্বরে
সর্বাঙ্গে জাগায় ঘ্রাণ, জীবনের পতঙ্গ জাগায়

এবার বসন্তে তুমি বুদ্ধকে চুমু খেয়ে যেয়ো।

দূরবীন

উত্তাল নাচের ঘর, সুন্দরীরা আসে আর যায়
উন্মাদ নর্তকীদেহে মদ ঢালে মুদ্রার রাজায়,
জন্মান্ধ জানলাগুলি আটকে রাখে বৈদ্যুতিক দিন
রক্ত, মাংস, ভ্রুণ—ঝরে যেতে দেখে দূরবীন।

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

সান্টা ক্লজ

কাল সন্ধ্যা থেকে ইথারের রাস্তায় যারা সান্টা ক্লজ সেজেছে, প্রত্যেকের কাছেই আমার একটি ইচ্ছের কথা বলেছি। আমাকে ঘিরে বেজে যাচ্ছিল হিন্দোল, মালহার আর হংসধ্বনি। কার বীণায় জানি না।

মধ্যরাত পর্যন্ত প্রত্যেক সান্টাকেই বলেছি, 'আমাকে একটা মারমেইড বানিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসো।'

আঠারোজন সান্টা আমাকে দিয়ে গেল রামধনু রঙে রাঙানো সব চকোলেট। কিন্তু কেউই পারেনি আমার ইচ্ছে পূরণ করতে। উনিশতম সান্টা ক্লজকে আমি খুঁজে পেলাম দুই নদীর সঙ্গমে, আনমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আকাশের তারাদের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছিল তার চোখের মলিন রং। আমি না-চাইতেই সে আমাকে বলল, 'তুমি যদি সাড়ে চার হাজার মাইল সাঁতরে এই দুই নদীর ধারে আসতে পারো, তবে তোমাকে আমি মারমেইড বানিয়ে দেবো। এটা তোমার পরীক্ষা'।

সে আমার মুঠোভর্তি করে দিলো ডার্ক চকোলেট। আমি চমকে গেলাম, আর হাওয়ার শরীরে পেলাম তার শরীরের ঘ্রাণ। আমি তো জন্ম থেকে চিনি এই ঘ্রাণ।

পরক্ষণেই সে স্বপ্নের ঘ্রাণ হয়ে উবে গেল বাতাসের শরীরে, আমি যে সন্তরণ জানি না, তা তাকে বলবার সুযোগও দিলো না।

মায়ের বলিরেখা

মা মরে যাবার কদিন আগে তার কপাল থেকে, হাত, গ্রীবা, সমস্ত শরীর থেকে বলিরেখাগুলি খুলে আমাকে দিয়েছে। আমাদের ভাইবোন সবাইকে দিতে চেয়েছে, কেউ নিতে চায়নি কেন আজও বুঝতে পারি না। আমিই সব বলিরেখা নিয়েছি। রেখে দিয়েছি খুব যত্ন করে রুমালের ভাঁজে, রুমাল রেখেছি আমার শৈশবের ডায়েরির ভাঁজে।

প্রতিটি বলিরেখা এক একটা অভিজ্ঞান, প্রতিটি বলিরেখায় লেখা আশ্চর্য সব বন ও বাগানের পথ, হরিদ্রাভ যাতনার মায়াময় শঙ্খমালা, ডোডোপাখির চঞ্চু থেকে রাহাজানি করে আনা সোনালি খড়ের রূপকথা, নদীর তলের ঘ্রাণ, জোছনার চূর্ণ, হাতির পালক, আরও যা আছে আমাদের কল্পনার অতীত।

বেশ কয়েক বছর পর পর এখন একটা করে বলিরেখা বের করে আমার কপালে বসাই। এখনও তিনটা বলিরেখা খরচ হয়েছে মায়ের। আরও অনেক বলিরেখা রয়ে গেছে শাদা রুমালের পেটে।

বাকিগুলি খরচ করতে গেলে লাগবে আমার আরও চারটা জীবন। এত জীবন কে দেবে আমাকে? কেউ দেবে না জানি, এই জেনে ভাবি, আমার মায়ের এত বলিরেখা কি তবে রুমালের ভাঁজেই রয়ে যাবে?

ঈশ্বরের অশ্রু

প্রতিদিনই পাশের বাসার শিশুটি আসে। আমাকে নাম ধরে ডাকে আর অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। অসম্ভব সব প্রশ্ন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আমি তার সব প্রশ্নেরই ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারি বলেই মনে হয়। কারণ আমার উত্তর শুনে সে সন্তুষ্ট হয়। যেমন আজ আমাদের মাঝে কথা হলো :

শিশু : নির্ঝর! তোমার মা কই, তোমার বাবা কই?

আমি : আমার তো মা নেই, আমার বাবাও নেই।

শিশু : তাহলে তুমি কোথা থেকে এলে?

আমি : আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি।

শিশু : আকাশ থেকে কেমন করে?

আমি : রেইনড্রপের মতো করে।
শিশু : তাহলে তুমি কি রেইন?
আমি : না, আমি রেইন নই, আমি টিয়ারড্রপ।
শিশু : টিয়ারড্রপ! কার?
আমি : গডের।

শিশুটির বয়স এখন পাঁচ। আমার কথা শুনে আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বসল, হাসল কুটি কুটি। তারপর দুহাতে আমার চুল খামচে ধরে বলল, 'তাহলে তোমাকে আমি আবারও চোখের মধ্যে নিয়ে নেব, নির্ঝর। আমিই তো গড।'

আমার সর্বনাম

সে। দিনশেষে সে এসে বসে নিজের সকাশে। নিজেকে জড়িয়ে ধরে শোয়, ঘুম যায় থেমে থেমে। নদীতে নেমে জড়িয়ে ধরে মীন, জড়িয়ে ধরে জলের ভেতর থোকা থোকা জলের তৃষা। হাত গলে জল নদীতে মেশে, তৃষা থেকে যায়। দিনশেষে সে এসে ভাসে সন্ধ্যার বাতাসে। বাতাসে ভোরের দাগ। দগদগে দাগে ছায়া ছায়াছবি নাচে।

সে জড়িয়ে ধরে আগুন। আগুন ছাই হয়ে যায়। আগুনের ছাই ওড়ে অঘ্রানের কুয়াশায়। সে জড়িয়ে ধরে রুমাল। সে জড়িয়ে ধরে ভাঁজ করা কাগজ, কাগজের বাঘ। সে জড়িয়ে ধরে দেয়াল। দেয়াল দীর্ঘ ও ঋজু হয়ে গ্রাস করে আসমুদ্র আশ্বাস।

সে মূলত মহাশূন্য। নীল দেখে তাকে ভেবো না আকাশ। আকাশ বলে কিছু নেই, আকাশ মানে মহাশূন্যতা। তুমি যখন যন্ত্রণাকাতর মাছ, নিষ্পলক চোখ মেলে বহুদূর ওপরে শূন্যে তাকাও, তখন তোমার চোখ যন্ত্রণায় নীল। তোমার চোখের রং শূন্যতায় লেগে ব্যাপিত নীল হয়ে যায়, তারপর মহাশূন্যকে তুমি আকাশ নামে ডাকো।

বদরুজ্জামান আলমগীর

শ্বেতপত্র

মানুষের স্বপ্ন কতটা দয়ালু, কত যে নৃশংস
হয়ে উঠতে পারে তা মানুষের দূরত্বের কাছে
ঠাঁই বসে থেকে আমি জানতে পারি।

মানুষ যে ঝড়জল বৃষ্টির বিচ্ছুরিত শস্যদানায়
কতটা মুহ্যমান আহত নুয়ে থাকতে পারে
আমি তা মানুষের উপড়ানো শিকড়ের কাছে
বসে থেকে আয়াসে জানতে পারি।

মানুষ কতটা নুনে রক্তে মিশে ঢালুর দিকে
নামতে পারে তা চোখের ছাইআভার ফাটলে
নিঃসঙ্গ ব্লেইডের নৃবিজ্ঞান কলায় লুকিয়ে থেকে
জ্যোৎস্নার টিপসই মাঝে আমি জানতে পারি।

এত পাথর এত যে অবজ্ঞার পরিখা আমার
তার থেকে ওঠে প্রজাপতির সংকলিত চিঠিখাম
এভাবেই আমি নক্ষত্রের আড়ালে দাঁড়িয়ে জানি
চোখের জল সবচেয়ে ঘন পাথরের শিরোনাম।

মহিষের শিং

আজ অন্তরালের ট্রেন উজান থেকে হুড়মুড়িয়ে নামে
ঢল বুঝি এক স্মৃতির ডুমুর আধুলিখানি নেমে আসে।

আমরা তখন রাস্তায় নামি সড়কে কারখানায় ঘামি

আমরা তখনই প্রথম বুঝি—খাঁটি বন্ধুতা সাইকেলের চাকা।
তারা উড়ে যায়, ঘুরে ঘুরে রাস্তায় সড়কে ঢালুতে যায়।
নব্বইয়ে আমরা যারা হলে থাকি, টিএসসির মোড়
ধরে হাঁটি; মধুর ক্যান্টিনে শত মাইল দূর আসমানের চূড়া
আমাদের পাশের টেবিলে নামিয়ে আনি, আড্ডা দিই।
আমরা ছেলেমেয়েরা সব দিনকে রাত পোনামাছের ঝাঁক
শ্লোগানে আরক্তিম কানকো বেয়ে কার্জন হলের দিকে যাই।

আমাদের যে হলে দেখা হয় না, দেখা হয় না ক্লাসরুমে
দেখা হয় শ্লোগানে, চর্যাপদে, বৃষ্টিবিদ্যুতের নির্দেশে শঙ্কায়।
আমাদের আরও দেখা হয়—লাঙলের ফলা ফেলে
যে জহির রিক্সার হাতল ধরেছে, পায়ের নিচে প্যাডেল
তোপখানা রোড, শান্তিনগর, কখনও মিরপুরে দেখা হয়।

তারা আছে আমাদের সাথে, আমরা আছি তাদের সাথে
আদমজীতে, জিঞ্জিরায়, সদরঘাট সাইদাবাদের কলে।
এভাবেই সেই নব্বইয়ে সেই ঘনঘোর রোদে, পণে নিরাশায়
শান্তিনগর মোড় থেকে রিক্সায় টিএসসি এসে নামি—
আমি ভাড়া দিতে যাই রিক্সার চালক মুহ্যমান তাইজলকে,
তাইজল বলে, না ভাই, আজ আমি ভাড়া নিমু না,
দুশমন সেনাশাসককে ফেলেছি আমরা, হার মানিয়েছি—
আমাদের দিন বদলে গেছে ভাই, আজ ভাড়া নিমু না।

এই কথাটা তাড়িয়ে বেড়ায় আজও আমাকে, হন্ত করে
না, আমাদের দিন বদলায় না—অসহায় শিঙে মাটি খোঁড়ে!

আমার পাড়া

আমার পাড়াটি গুণগতভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে
সাদা লোক—যাদের আমরা উন্নত সভ্যতার
মানদণ্ড মনে করি—তারা এখন আমার
পাড়ায় নেই বললেই চলে শহরতলি গ্যাছে তারা।
ফলে পাড়াটি দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে;
পারিবারিক বন্ধুরা আমার বাড়ি বেড়াতে এলে
পরিস্কার বুঝতে পারি—তারা মনখারাপ করে।

আমার কিন্তু পরিস্থিতিটা ভীষণ ভালো লাগে,
নিজের অজান্তেই মটরশুঁটিদানার মতো হেসে ফেলি—
যৌনতার ব্যাপারটাও খাপেখাপ এমনই—
পশ অ্যারিয়া থেকে কেবল নিচের দিকে নামতে থাকে।

পঞ্চমী জোছনায়

দেবী সরস্বতী আদিতে নদী ছিলেন।
সরস কথাটির মানেই জল—নদীর বহতা,
সরস থেকেই সরস্বতী কথাটি আসে।
বড় পরীক্ষা পাশ দিয়ে এলে
আমরা কাউকে এভাবেই স্নাতক বলি।
জল—আমাদের সংরাগ জাতপাত জানে না,
জল অপরিচ্ছন্নতা ধুয়েমুছে
অপেক্ষার সমিল নির্মল বয়ানে
আমাদের লতাশাইল ধান করে তোলে।
নিজামুদ্দিন আউলিয়াও ফুল তুলেছিলেন,
বসন্ত পঞ্চমীর সংকলিত জোছনায় নরম
ডুবেছিলেন ভেসেছিলেন ও সাঁইয়ের পরম।
মা সরস্বতী, করো অবিদ্যাধারী আমায়—
দুঃখী হয়ে উঠি সুরের জলে, তৃণতায়।

তাদের নাম ছিল

আমাদের গাত্রবর্ণ কিছুটা ময়লা ছিল
সেইসময় খানিক চাপা রঙকে ময়লা বলা হতো,
কী অসামান্য সম্পদ ছিল ওই কৃষ্ণ বর্ণটুকু।
আমাদের গায়ের রঙ কখনোই
ফিরিঙ্গিদের মতো সাদা-সোনালি হতো না।
শ্রীপঞ্চমীর দিনে আমাদের পাড়ার সব পোলাপান
কাঁচা রোদের হাতের নিচে কিছুটা জবুথবু
মহীয়ান ভঙ্গিমায় জলচৌকির উপর বসতাম—
আমাদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান
ওইসব কোনোদিন জানতামটানতাম না;

আমরা উঠোনের কাঁচারোদে গা উদাম করে বসতাম
আর আমাদের মা বোন দিদিরা
ডলে ডলে কাঁচাহলুদ, নিমপাতা
আর কমলার খোসার মণ্ড শরীরে মাখিয়ে দিত।
মণ্ড গায়ে শুকালে স্নান করতে
লাফিয়ে পড়তাম আউলিয়াখানা গাঙের জলে।
আমরা যারা সকালের মৃদুআঁচ রোদে
পিঠ খুলে বসতাম তাদের নাম ছিল—
রায়হান, এমরান, জয়দেব, সন্দ্বীপ, চন্দন,
আর যারা আমাদের শরীরে মণ্ড ডলে দিত
তাদের নাম ছিল মিনতি, আয়েশা বানু, পূর্ণিমা সাহা।

হাসান শাহরিয়ার

ম্যাট্রিক্স

আবছা ভোর। সবাই ঘুমাইতেছে।
ঘুমাইতেছে শহরের পাখি।
তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া রইছি আমি।
দূর হইতেছে ট্রেনের বিলাপ, দূর হইতেছে ভাষার ব্যর্থতা।

ট্রেনের কেবিনে মুখোমুখি তুমি আর আমি
অথবা এক স্টেশনের পরে —
আরো অনেক অনেক স্টেশনে তোমারে দিতেছি ধাওয়া
কোথায় তোমার গোপন অস্ত্রাগার?
যেইখানে যাই — শুধু শূন্যস্থান।
পশু ও পোকার মুখের মতো ছল ও সকল সংলাপ।

আবছা ভোরে তোমার সমস্ত চোখ আগুনে পোড়া সুতার কারখানা।

অপর এক ঝড়

অনেকদিন ধইরা আমি অপর এক ঝড়

ঝড়ের ভিতর আমার সকল কথা
অন্ধকারে
ট্রাকের হেডলাইটের পাশে
দ্বিধা নাকি বিকট এক পাজলের মতো
তোমার কাছ থেইকা মিলাইতে চাইতেছে দূরে —
কোনখানে? অবসাদে-মলিন এক সাঁকোর কিনারে...

তারপরে শুকনা পাতার সীমানা তোমার

আমার মরে-যাওয়া কেমনে আটকাবা তুমি?
কাতর বেলিফুল তোমার শরীরে বাসি আলো মাখে।

নাকি ঘরের দিকে ফিরতে চাইতেছ তুমি?
এক রাক্ষসের ক্ষুধা লুকাইয়া রাখতেছ নিজের ভিতর।
অপর এক সন্ধ্যার ছায়া যেইখানে জ্বলতেছে সকাতর
তোমার কথা সেইখানে টুকটাক ভাইবা যাইতেছি আমি।

পাথরের গ্রাম

তোমার এই বিষণ্ন পাথরের গ্রামে
আর কে কে আছে? তুমিও কি পাথরের ঘর?
না অবসাদ, বিরাম-বিলাপের যত অপলাপ
মায়া নাই, নাই আহত টিলার খানিক অবহার।

গ্রামের মুখে তোমারে কি যাইতেছে দেখা?
টানটান; কাঁপাকাঁপা রেখার মতো...আবছা ব্যাকুল...
তোমার স্বগতোক্তি, সমস্ত ধ্বনি
পাথর-রঙের মতো খেলতেছে পাথরভাঙার খেলা।

গ্রামের মুখে তোমারে কি যাইতেছে দেখা?
যেন হল্লা করতেছে দূর টাওয়ারের জমাট বিষাদ।
এই সন্ধ্যাবেলা তোমার বিষণ্ন পাথরের গ্রামে
সকাতরে হারাইতেছে সকল বিনীত পাখি।

জারমুনি

এই সন্ধ্যায় আচমকা মনে হইলো ঘরে আসছো তুমি
ঘরের ভিতর ছড়াইয়া যাইতেছ ধীরে, যেন ক্লোরোফর্ম —
যেন ক্লান্ত মোটরবাইক, সন্ধ্যার অন্ধকারে
ঘুইরা বেড়াইতেছ পৃথিবীর সকল শূন্যস্থান।

আমারে যদি ডাকো? আহত পাখির গোপন নির্বেদ আমি।
রাত আর নিয়তি বিলাপ করতেছে বিনীত তাঁবুর কিনারে।

মুখ ও মুখোশের ভিড়ে সকাতরে উধাও হইতেছে শোক...

এই সন্ধ্যায় তুমি আর আমি ডাকভোলা দুই রকমের পাখি?

চাঁদের পেটে কৃমি

রোদের ভিতর তুমি একটা শুকনা গোলাপের পাতা।
গাছের ডাল, ডালে-বসা পাখি
আকাশের ধূসর খেয়াল...
কার কার ভাষা বুইঝা ফেলছো তুমি?

পেটভর্তি কৃমি নিয়া শিশুর কপালে উঠতেছে চাঁদ।

এক সন্ধ্যায় ওই ইছামতি ডুব দিবে নিজের ভিতর
পাড় ধইরা তোমারে পোহাইতে হবে রাত।

পাড় ধইরা তুমি কত পোহাইবা রাত?

ছায়া রেখে যাও অবসরে

সব পথে তুমি কতটা রাখতে পারো চোখ?
এক পথে অবধারিত আমি; হেঁটে যাই
ভ্রান্তি আর ভুল আলেয়ার বিনীত সন্ত্রাসে
একা একা। তুমিও কি ছুটতেছ না? ব্যর্থ;
রাঙানো মুখোশের ভিতর বাজতেছে রোজ
তোমার পরাজয়ের লোকগান, আবহমান।

অতএব টিলার গায়ে সন্ধ্যা নামার পরে
তোমার ফিরে-আসার অপেক্ষা করবো নাকি?
তোমার পোড়া মুখ, সেলাই-খোলা সফেদ ছায়া।
দূর অবহারে নিথর ঝিলিমের স্রোত, রূপালি আলেয়া।

আমার সকল পথে তুমি রেখে যেও ছায়া, অবসরে।

জয়দেব কর

বাউল তোমার হৃৎপিণ্ডে

কোনও-এক পূর্ণিমার কথা তুমি মনে রাখবে যদিও
আমি ভুলে যাব সব, স্মৃতির ভেতর গোলাপের চারা
মরে যাবে; নয়তো আপনাআপনি পাখির মতো
গেয়ে উঠবে গোপন-সন্ধ্যার বিদ্রোহী তিল
এই দুঃখ, এই মেঘ কিছুই ছোঁবে না আমার চিবুক;
মেঠোপথে খালিপায়ে যে-কিশোরী আসবে
অনাগত যৌবন নোয়ানো নমিত কবিতা-বুকে
অঞ্জলি রেখে যাব তার জন্য সামান্য, তেমন সঞ্চয়
ফেলে গেছি অনিচ্ছার অতল সমুদ্রে। তোমাকেও
যদি ডাকি প্রস্থানের কালে, বড়জোর শালিকের নাচে
মুগ্ধ বালকের কথা শূন্যের নিরস আঙিনা ভরবে;
কিছুই থাকবে না; না প্রেম, না বিরহ, কিছুই না
তবুও বলি মুদ্রাদোষে অথবা নিয়মে একা বাজি
একতারা। তুমি তার সুর তোলো একা তর্জনীর
বাউল তোমার হৃৎপিণ্ডে দুঃখ দেবে পরমের দোলা।

সোনার ঝিলিক অন্ধ করুক

আমায় আবার ডাক দিয়ে যাও, আমায় আবার ফিরিয়ে নাও
মাথার ভেতর ঘুরছে কেবল তুমি তুমি জুয়োর আসর
আমার অমানিশা, আমার পূর্ণিমারাত ডুবছে কেবল
আমার ডিঙি ভাসুক, হাসুক কেবল ছল-ছলা-ছল জলের আঁচল!

তোমার রোদের ছোঁয়ায় সোনার ঝিলিক অন্ধ করুক
বন্ধ করুক দূরের দুয়ার সান্ত্বনাতে ডুবে থাকার মিথ্যে হিসেব
আমায় ফুল এনে দাও, আমায় রাত এনে দাও চন্দ্রিমাভর ব্যথায় ভরা

আমায় শীতল করো আমায় ভালোবাসো, আমায় ভাসাও! ভাসাও! মিটাও খরা!

যাতায়াত

ফেরার পথে আমরা কেবল শূন্য শূন্য শূন্য ভাসি
একা চিলের আকাশ-নদী দূরে সরে যায়!

তুমি তিলোত্তমার ছবির মতো নাই বা থাকো
দিব্যি আমার দুপুরগুলো বিকেল হয়ে ছড়িয়ে রবে;
আমার ভালোবাসার সর্বনাশে
তোমার নিত্য নিমন্ত্রণ!

২

আজন্ম যে বন্ধ দ্বারে নিত্য যাতায়াত
তার ভেতরেও তুমি, বাহিরেও তুমি!
পারিজাত!
ও পারিজাত!
অপরাজিতা মুখে তোমার
শুদ্ধ প্রণাম ঠেকিয়ে যাই বিষ্ণুমুখী পথে।
এ কপাট খুলবে তোমার জগন্মাতা বুকের হাওয়া
প্রতীক্ষার এই বলাকাভোরের ঘোরে
আমি কেবল ভুল-করা এক পতিত পথিক–
ভালোবাসার অন্তর্ধানে শূন্য পোশাক!

পথচিহ্ন

আরাধ্য বকুলের দেশে যাই, বিরহে নাওখানা, আহা,
ঘোরপাকে মেতেছে তত! অনেক পথের চিহ্ন
কপালে ঝুলে রয়! যুবতীর শরীরে মেঘ আর
বৃষ্টিজলমাখা নগ্নপায় ঈশ্বরকণা ঈর্ষা ছড়ায়!

ভেলার আত্মকথা : বেহুলা অনিবার্য নাম জেনেও
কিছুতেই জাগেনি দুঃখমোচি বৃক্ষের অঙ্কুর
ফুলেরা কবিপ্রায় জীবনের সৌন্দর্য যেন
স্থবির ইস্টিমারবন্দরের বেহায়া হাসি!

সময়ের স্রোত বা জটিলতার চিহ্নগুলো

আহমদ সায়েম

শিরোনাম

লেখায় একটা শিরোনাম দিতে হয়, তাই দেওয়া — না-দিলে দেখতে বেখাপ্পা লাগে, পড়তে বেজুইত লাগে, গদ্য না-পইড়া বোঝা যায় না। বলা যায়, লেখার একটা ধরন বা নমুনা বোঝানোর পাঁয়তারার নাম হচ্ছে 'শিরোনাম'। আমার এই শিরোনামের আগে আরেকটা শিরোনামে পাঠকের চোখ আটকে আছে, তা হচ্ছে 'অন্যগল্প'।

সত্যি বলতে, নাম একটি মাধ্যম মাত্র — পাঠকের কাছে পৌঁছানোর। গদ্য লেখেন আর গল্পই, যদি পাঠক ধরতে না পারে, আশকারা-মশকারা লাগিয়ে লাভ হবে না। মানে, এই বিশাল আকাশের বাইরে যেতে পারবেন না; যেতেই যখন পারবেন না, তবে দেখেন — কী করে ঘুরছে সব—সবাই নীল চাদরের নিচে। এখানে বাঘ আছে, বিচ্ছুও আছে, পাখি আছে, মশাও ওড়ে। অনেকটা ভাতের থালার মতো আমাদের জীবন। এখানে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস — সবই থাকবে। নুন কিন্তু নিজের একটা জায়গা করে নেয় — 'নিয়ে নেয়' বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? বুঝতে পারছি না। কারণ, তাকে জায়গা দিতে হয়, না-দিলে কোনোকিছুই তৃপ্তি নিয়ে খেতে পারবেন না।

জীবন হচ্ছে তা-ই — অপমান করে বা অবহেলা করে কাউকে ঠকাতে পারবেন না। আমরা মনে করি, তাকে ঠকাতে পারলাম; কিন্তু ঠকানো যায় না, নিজেকেই ঠকানো হয়। কিন্তু তা বুঝতে অনেক সময় খরচ করে নেই আমরা। এই বুঝটা হয়, যখন ফিরে যাবার পথ আর খোলা থাকে না।

অন্যায় একবার শুরু করে দিলে লবণের পরিমাণ বোঝা আর হয় না, হয়ে ওঠে না। পরিমিতিবোধ জেগে উঠলে, জীবনের রঙ — নানান রঙে দেখতে বাধ্য হবেন। কেউ আটকাতে পারবে না।

সময়ের স্রোত

ভাই, এখনও আপনি চুপ থাকবেন?

কেন? কী বলতে চাইছো? আমরা তো কথাই বলছি, চুপ থাকলাম কই?

তা ঠিক বলেছেন, চুপ থাকেননি। আমি বলছি, গাজায় এত মানুষ মরছে, সবকিছু দেখেশুনে আপনি বলবেন — 'ঠিক আছে'! সব মেনে নেও?

প্রথম কথা হচ্ছে — ওরা তো মানুষ মারছে না, ওরা মুসলমান মারছে।

ও, আপনি তো এখন ভিন্ন প্রসঙ্গ টানলেন ভাই। আমার আর কিছু বলার নেই। আমি উঠি, কিছু কাজ আছে।

দাঁড়ান — আপনি যে-প্রশ্ন করেছেন, আমি বুঝেছি। এবং খুব ভালো করেই বুঝেছি। কিন্তু কিছু করার নেই ভাই। সারাবিশ্ব এখন এভাবেই দেখে সবকিছু, এবং প্রায় সবাই।

আপনি যদি মানুষকে শুধুই 'মানুষ' হিসেবে দেখেন, তাহলে একভাবে দেখবেন। আর যদি তাকে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কোনো ধর্মের মানুষ ভাবেন, তাহলে তার প্রতি ব্যবহারও আলাদা হবে। হয়ে যায়, আমি করি, আপনিও করেন। অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

সেটাই আজ বড় আকার ধারণ করেছে। আর কিছু না। আপনি নিজেকে বদলাতে পারবেন না, আমিও পারব না। তাহলে, তার কাজ অপছন্দ করার মতো অবস্থাও আমাদের হাতে নেই। কী নিয়ে প্রতিবাদ করবেন! আপনি যে কাজ করছেন তা দশজন দেখছে না, তাই ভাবছেন আপনি সৎ আর সত্য। তার কাজ সবাইকে দেখিয়ে করছে, এখন ভাবেন কে সৎ?

আমাদের হাতে যখন বিচারের ভার পড়ে, তখন আমরা কী করি? আমার বাবা, ভাই, বা বোনের জন্য একরকম বিচার করি, আর আপনার ভাইবোনের জন্য অন্যরকম হিসাব। এমন যুক্তি দেখাই, যাতে পৃথিবীর কেউ তা অস্বীকার করতে না পারে। অথচ শুধু আমি জানি, কোন সূত্র ধরে আপনার রাজারে 'চেক' বলছি।

যে গাজায় মানুষ মারছে, সে জানে এরা মানুষ। সে জানে সেও মানুষ। যে মরছে, সেও জানে — সবাই মানুষ। কিন্তু সব জেনেই আমরা থিয়োরি কপচাই, আমরা রঙ দেখি, রঙ নিয়ে খেলি, ভাবি। ভাবতে ভাবতে বলি — ওদের না-মারলে শান্তি আসবে না।

অ্যাঁ — সবাই শান্তি চায়। কিন্তু শান্তির তোমার জন্য এবং আমার জন্য আলাদা আলাদা হিসাব, আলাদা বিচার।

অথচ যে-বিচার তোমার জন্য রাখলাম, সেটাই আসলে আমার জন্যই রেখে দিচ্ছি; তার খেয়াল নেই। সময় সব ফিরিয়ে দেয় ভাই। যখন বুঝে আসে, তখন সময়ের স্রোত উল্টোপথে বইতে শুরু করে দিয়েছে।

সময়ের কাঁটা একইভাবে চলে। সে কারো মুখাপেক্ষী নয়। সমুদ্রের স্রোত যখন ফিরে যায়, তখন কে কোন ধর্মের, কার গায়ের রঙ কী — তা দেখার জন্য সময় নেয় না।

আমার অধিকার

আমরা জানি না আমাদের অধিকার কী। যা জানি, তা হচ্ছে — খাবার এবং থাকার ব্যবস্থা, আর কথা বলার স্বাধীনতাকে আমরা অধিকার মনে করি। কিন্তু আমি মনে করি, আমার অপছন্দের অধিকার থাকা উচিত। আমি কী পছন্দ করি, তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হলো আমি কী অপছন্দ করি।

আমার অপছন্দ জানলেই আপনি আমাকে মারতে আসেন, বকা দেন, অপমান করেন — সে-রকম স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন আছে? নেই। আমার 'রাগ' আপনাকে দেখতে হবে, আমাকে রাগ প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। আপনি সেটা মেনে না-ও নিতে পারেন, কিন্তু আমার অপছন্দ, আমার রাগ — সবই আমার। এগুলো কাউকে আঘাত না-করেও প্রকাশ করা যায়, এবং সেই অধিকার আমার থাকা উচিত। এবং তোমারও।

'আমার' শব্দটা খুব সাধারণ নয়। আমরা যখন 'আমার' বলি, তখন যেন অন্যকে অবহেলা করে, অপমান করে নিজের 'আমি'-কে জয়ী করি। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' তখনই, যখন অন্যের সামনে নিজেকে ছোট করে রাখতে পারি — নম্রভাবে, সংবেদনশীলভাবে। অথচ, নিজের সম্মান যে কতটা মূল্যবান, তা আমরা সময়ের সঙ্গে হারিয়ে ফেলি।

আমার চাওয়া, আমার ভাবনা, আমার রাগ — সবকিছু নিয়েই আমি একজন মানুষ। আর মানুষ হিসেবে আমার সম্মান, স্বাধীনতা, এবং ভালোবাসা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। এই অধিকার কেউ দয়া করে দেয় না, এটি আমার নিজের। বুঝতে দেরি হলেও, আজ আমি তা বুঝি। আমি তাও

জানি — আপনিও বোঝেন, কিন্তু আপনার থিয়োরি না-কপচাইলে ঠিকটাক দাঁড়ায় না, তাই কলারে বলেন বেনানা।

মানুষ মানুষকে যেভাবে অত্যাচার করে বা করতে পারে, মনে হয় না অন্য কোনো প্রাণীর এমন অমানবিক আচরণ দেখেছি আমরা। বুকে আমাদের মানবতার জোয়ার বইছে, অথচ আচরণবিধি দেখলে ভয় লাগে, চোখের লজ্জাও যেন সরে গেছে।

লেখাটা পাঠকের চোখে কতটা স্পষ্ট করতে পারলাম জানি না, তবে জটিলতা না-রাখার চেষ্টা করেছি। নির্মাণ করতে চেয়েছি সহজ। চেতনার চিহ্নগুলো জেগে উঠুক, এইটুকুই।

পক্ষে-বিপক্ষে

এত এত বিষয় নিয়ে মানুষজন ভিডিও বানাচ্ছে — যা আমরা মোবাইল স্ক্রল করতে করতে দেখি। নতুন কোনো বিষয় সামনে এলে, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হয়ে পড়ে কঠিন। তাই পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়াটা কঠিন হয়ে যায়। এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কারণ ভিডিওটা দেখা মাত্রই — লাইক-কমেন্ট না করলেও — মনের ভেতরে আপনি অজান্তেই কোনো এক পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছেন। এ অবস্থান নেওয়া আপনার জীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে না — এমন ভাবার সুযোগ নেই। বরং, প্রভাব ফেলবেই। ভিডিও দেখেছেন কি না, তার প্রমাণ না থাকলেও, আপনার ভেতরে তার একটা প্রতিক্রিয়া জন্মেছে — এটা তো স্পষ্ট।

প্রকৃতি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। যা ঘটছে, তার সবই পূর্বনির্ধারিত। তবুও, ভিডিও দেখে তৈরি হওয়া ভালো বা খারাপ মেজাজ আপনার জীবনে একটা প্রবাহ তৈরি করে দেয়। ভালো মেজাজ হলে আপনার ভালোর সমুদ্রে যাত্রা হবে; আর খারাপ মেজাজ হলে, তার তীব্রতা লাল মরিচের ঝাল কী কী ভাবে হতে পারে তার সব দলিলে অন্তত টিপসই দিতে লাগবে।

কথা হচ্ছে আমি তো বাতিই চিনি না, কোন বাতিতে কী হয় বা কিসের জন্যই বা বাতিগুলো জ্বলে আর নিভে, সে তার কিছুই জানে না, তার জন্য প্রকৃতি কি সিদ্ধান্ত নেবে? মানে ভিডিও দেখে যে সিদ্ধান্ত নিলেন তার পেছনের গল্প তো জানা নেই আমার বা আপনার, কিন্তু ভিডিও দেখার পর আমরা অজান্তেই একটা সিদ্ধান্ত পৌঁছে যাই।

আমি মনে করি পৃথিবীর সব গল্পই লাল আর সবুজ বাতিতেই শেষ, যারা বাতি চিনে না তারা লাল বাতিতে ভুলভাবেও পার হয়ে যাবার সুযোগ থাকে বা প্রকৃতি সুযোগটা তৈরি করে দেয়, আবার দেয়ও না। যারা জেনেবুঝে লাল বাতি অমান্য করে, প্রকৃতি তাদেরকেও সুযোগটা দেয়।

কথা হচ্ছে — অন্যের দেখে শেখা লাগবে না, শিখতে পারবেনও না। নিজেকে দেখার চোখ তৈরি করে না নিতে পারলে, লাল নীল বাতিতে কিচ্ছু হবে না। মানুষ আপনার কাছে থেকে শিখে নেবে, আর আপনি বা আমি আমার কথাই বলছি — চারপাশে শুধু ভুল দেখতে পাবেন। অথচ কিচ্ছু নেই, চলার পথের গতি বাড়ানোর জন্য সে আসে আপনার পাশে দাঁড়াইতে। সে জানে না যে আমার পাশে সে দাঁড়ানোর যোগ্য নয়, আর আমি জানি না সে আমারে কতেটা পছন্দ করে...

সবরকম বই পড়ি, মনকে মনন করি

Philadelphia Book Fair

SATURDAY 31 ST MAY, 2025

VENUE: PENTECOSTAL CHURCH

7101 PENNWAY ST, PHILADELPHIA, PA 1911

TIME: 10 AM TO 9PM

বইমেলার অনুষ্ঠান ধারাক্রম

সকাল ১১:০০ - **স্টল উদ্বোধন**

সকাল ১১:১৫ - দুপুর ১:০০ শিশু/কিশোরদের চিত্রাঙ্কন- শিশু কানন।

দুপুর ১:০০ - **মেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন**।

দুপুর ১:১৫ - ২:০০ **বইয়ের স্টল পরিদর্শন।**

দুপুর ২:১৫ - ৩:০০ অতিথিদের মঞ্চে আগমন ও পরিচয় পর্ব।

৩:১৫- ৪:০০ - বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতে ও বাঙালি মননের আবেদন নিয়ে আলোচনা।

৪:০০ - ৪:৪৫ - লেখক, কবি, প্রকাশকদের গোল টেবিল বৈঠক।

৪:৪৬ - ৫:৩০ - সমাজের অগ্রযাত্রায় নারীর ভুমিকা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক।

৫:৩১ - ৬:১৫ - কমিউনিটির সংগঠক, উদ্যোক্তা ও বিদ্বৎজনদের

পরিচিতি ও আলোচনা।

৬:১৬ - ৬:৪৫ - শিশু / কিশোরদের পুরস্কার বিতরণী।

সন্ধ্যা ৭:০০ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

রাত ৯:০০ সমাপণী।

ADIM
FASHION
& BOOKS

এবার ঈদে ঐতিহ্য ও আভিজাত্যে মোড়ানো ছেলেদের
পাঞ্জাবি এবং নারীদের ট্রেন্ডি পোশাকের সমাহার

- We sell three-piece desi dresses here for affordable price.
- We want to come forward with your cooperation.

Zelle

+1 (929) 732-5421
friday, saturday, sunday
+1 (929) 732-1756
Anytime.
ahmedsayem@gmail.com (Paypal)
+1 (929) 732-5421 (zelle)
7820 Summerdale AVE Philadelphia, PA 19111
adimfashion2

CashApp **paypal** **venmo**

BANAFUL SUPERMARKET

বনফুল

সুপারমার্কেট

Grab Halal حلال HALAL Eat Halal

1941 Glendale
Avenue Philadelphia, PA-19111

Eat Halal
(215) 904-6019

IFTAR MENU

$10 PER BOX	$12 PER BOX
Biryani	Biryani
Veg Pakora	Aloo chop
Beguni	Samosa
Mirch Pakora	Veg Pakora
kajoor	Beguni
Chana	Mirch Pakora
jalebi	kajoor
Piazu	Chana
	jalebi
	Piazu

Woondal
Restaurant & Grill

We also offer special Iftar catering during the month of Ramadan

215 902 9710

7602 Castor Ave, Philadelphia, PA 19152
www.woondalrestaurantandgrill.com

ATM AVAILABLE

ZERO POINT MINI MARKET

حلال
HALAL

জিরো পয়েন্ট মিনি মার্কেট

7601 CASTOR AVE

CANDY • SODA • SNACKS • ICE CREAM • GROCERY • HOUSE HOLD GOODS
COPY • CELLPHONE ACCESSORIES • PHONE BILL • PASSPORT PHOTO

(215)552-2955

IT'S A NEIGHBORHOOD BASED CONVENIENCE STORE

Store wide on opening day

ADIM আদিম বইঘর

Zelle paypal CashApp venmo

মননাশ্রয়ী বিনোদনের সৃজনসম্ভার

gaanpaar.com

দৈনিক দ্রষ্টব্য ওয়েবপত্রিকা
Click around the clock & keep rolling with
raashprint.org

রাশপ্রিন্ট
ঝকমারি এই দুনিয়াদারি দেখাদেখির দূরবীন

“সবরকম বই পড়ি, মনকে মনন করি”
ফিলাডেলফিয়া
বই মেলা
২০২৫
SATURDAY 31 ST MAY, 2025
VENUE: PENTECOSTAL CHURCH
7101 PENNWAY ST, PHILADELPHIA, PA 1911
TIME: 10 AM TO 9PM
যোগাযোগ :
(267) 584-4235 আশরাফুল আরিফ (267)496-3494 কামরুল হাসান
(267) 461-1346 আব্দুল হাফিজ চৌধুরী,
(215) 618-7636 জোহরা খাতুন কলি (929) 732-5421 আহমদ সায়েম

Philadelphia

ফিলাডেলফিয়া

সাহিত্যপত্রিকা

ফিলাডেলফিয়া
বইমেলা
২০২৫

Philadelphia
ফিলাডেলফিয়া
সাহিত্যপত্রিকা

সম্পাদক আহমদ সায়েম

সম্পাদকীয় সংযোগ
7820 Summerdale AVE Philadelphia PA 19111
ahmedsayem@gmail.com +1 (929) 732-5421